রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

করকমলে

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই গ্রন্থের প্রথমদিকের কিয়দংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিরণকুমার বসু বক্তৃতামালা' রূপে পঠিত হইয়াছিল। এইরূপ সুযোগ পাওয়া সম্মানের বিষয়—তজ্জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনেকের কাছে আমি সাহায্য পাইয়াছি, তন্মধ্যে রামতনু লাহিড়ী গবেষক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাইয়াছি বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সহযোগী অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীপুলিনবিহারী সেনের কাছে। তাঁহার সাহায্যের পরিমাণ সুবৃহৎ তথ্যপঞ্জীরূপে গ্রন্থশেষে বিরাজ করিতেছে। ইহা কেবল তাঁহার বন্ধুপ্রীতিবশত নয়, রবীন্দ্রসাহিত্যে অগাধ প্রীতিই ইহার আসল কারণ। উক্ত তথ্যপঞ্জী ব্যতিরেকে আমার গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে গ্রন্থের মান ক্ষুণ্ণ হইবে আশঙ্কায় তিনি অল্পদিনের মধ্যে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তথ্যপঞ্জীটি সংকলন করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তথ্যপঞ্জী সংযোজনার ফলে গ্রন্থের আকার ও মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। রবীন্দ্রসাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রীপুলিনবিহারীর কাছে আমার ঋণের অন্ত নাই, এই উপলক্ষে সে ঋণের পরিমাণ আরও অনেকটা বাড়িল। তাঁহাকে আর-একবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাগুলির পরেই রবী-প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ হিসাবে তাঁহার ছোটগল্পগুলির স্থান। বিচিত্র প্রকৃতির বহু নাটক তিনি লিখিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো সেই সব নাটকের কোন কোন পর্যায়, যেমন কাব্যনাট্যগুলি, তাঁহার গান ও কবিতার পরেই বা সঙ্গেই সমান অমরতার আসন দাবি করিবে; ছোটগল্পগুলি তেমন আসন পাইবে কি না জানি না। কেননা, সাহিত্যিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, পদ্যের পরমায়ু গদ্যের চেয়ে বেশি। কিন্তু সেই শেষ বিচারের কথা এখানে মুলতুবী রাখিয়াও অনায়াসে বলা যায় যে, ছোটগল্পগুলিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ ধর্ম যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, এমন তাঁহার সব নাটকে নয়। তাঁহার প্রথম বয়সের অনেক নাটক, যেমন রাজা ও রানী এবং বিসর্জন, শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অমূল্য হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ নয়, তাহাতে তিনি তৎকালপ্রচলিত পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডির ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এরকম স্বধর্মবহির্ভূত পদক্ষেপ নাই বলিলেই হয়, কেবল প্রথম বয়সে রচিত তিনটি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁহাদের পদাঙ্কের নীচে অস্পষ্টভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের পদচিহ্ন যেন চোখে পড়ে। কিন্তু সে তিনটিকে ছাড়িয়া দিলে, যখনই তিনি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছেন, একেবারে স্বক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন, অপরের জমিতে আধিচাষ করিয়া রাজস্ব জোগাইবার দায় বহন করেন নাই। শুধু তাই নয়, সেই হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত ছোটগল্পের ধারা বহন করিয়া আসিয়াছেন; আরও দেখিতে পাইব যে, সে ধারা তাঁহার গান ও কবিতার ধারার সঙ্গে সমান্তরালতা রক্ষা করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সেইজন্যই দেখিতে পাইব যে, তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে যে সব

পরিবর্তন ও ছায়ালোকপাত ঘটিয়াছে, সে সমস্তই চিহ্নিত তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে। কাজেই, যে মাপকাঠিতে তাঁহার কবিতার বিচার করি সেই মাপকাঠিখানা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে অন্যায় হইবে না, বরঞ্চ সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়। সুফল পাওয়া যাক আর না যাক, সেইভাবে বিচার করিবারই আজ ইচ্ছা। কিন্তু সে কাজে নামিবার আগে বিচারের ক্ষেত্রটির সীমা-সরহদ্দ স্থির করিয়া তাহার সম্বন্ধে ধারণাটি পরিষ্কার করিয়া লইব।

আমার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। ছোটগল্প বলিতে এখন বুঝিতেছি, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ গল্পগুচ্ছ, সে, গল্পসল্প ও তিনসঙ্গী। রচনাকাল ১৮৮৪ সাল হইতে ১৯৪১ সাল, অর্থাৎ কবিজীবনের সাতান্ন বৎসর কাল।[১]

অতএব আলোচনার বস্তু-পরিধি দাঁড়াইল ১১৮টি গল্প আর কালপরিধি দাঁড়াইল কবিজীবনের সাতান্নটি বৎসর। বস্তু ও কাল দুই-ই ব্যাপক, যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

গল্পগুলির মর্মে প্রবেশের আগে বস্তুপরিধি ও কালপরিধি সম্বন্ধে আরও একটু সচেতন হওয়া আবশ্যক, তাহাতে কবিমনের কিছু কিছু রহস্য প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা।

---

১ কিন্তু ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত ভিখারিনী গল্পটি ধরিলে দাঁড়ায় চৌষট্টি বৎসর। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত মুকুট গল্পটি গল্পগুচ্ছে সন্নিবেশিত না হইলেও এটিকে ছোটগল্প বলিয়াই ধরা হয়। তাহা হইলে তাঁহার সাকুল্য ছোটগল্পের সংখ্যা এইরূপ দাঁড়ায়—

গল্পগুচ্ছের তিন খণ্ডে	৮৪
'সে' গ্রন্থে অনুচ্ছেদ	১৪
গল্পসল্পে	১৬
তিনসঙ্গীতে	৩
মুকুট	১
ভিখারিনী	১
	১১৯

১৮৯১ সাল (বাংলা ১২৯৮ সাল) হইতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার রীতিমতো সূত্রপাত। ভিখারিনী গল্পটি ছাড়িয়া দিলে তার আগে তিনটি মাত্র গল্প তিনি লিখিয়াছেন, ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা ১৮৮৪ সালে আর মুকুট গল্পটি ১৮৮৫ সালে।

১৮৯১ হইতে ১৮৯৫ (বাং ১২৯৮-১৩০২)-এর মধ্যে পাইতেছি চুয়াল্লিশটি গল্প, সমগ্র গল্পগুচ্ছের অর্ধেকের কিছু বেশি, প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধনা পত্রিকার জন্য রচিত। এই কয়েক বছর সোনার তরী ও চিত্রা কাব্য রচনার সময়।

তারপর ১৮৯৬-৯৭ সালে (বাং ১৩০৩-৪) কোন ছোটগল্প পাই না, কেননা, সাধনা পত্রিকা বন্ধ হইয়া যাওয়াতে মাসে মাসে গল্পের তাগিদ আর নাই। তার বদলে পাইতেছি চৈতালি কাব্য এবং মালিনী নামে কাব্যনাট্য।[২]

আবার ১৩০৪ সালে পাই কাহিনী নামে প্রকাশিত কাব্যে সন্নিবেশিত কাব্যনাট্যগুলির অধিকাংশ।[৩]

১৮৯১ (১২৯৮) সাল হইতে ছোটগল্পের যে ধারা অবিচ্ছিন্ন স্রোতে বহিয়া আসিতেছিল, গল্পের চাহিদা না থাকায় তাহার বিরাম ঘটিল না, ঘটিল কেবল রূপান্তর। এই দুই বছরে লিখিত অধিকাংশ কবিতাই কাহিনীমূলক, কাহিনী নামেই তাহার পরিচয়। এমন-কি, চৈতালির অনেকগুলি কবিতাই গল্পের আভাস বহন করিতেছে, আর একটু চাহিদার চাপ পড়িলেই সেগুলি রীতিমতো গল্পাকারে বিস্তারিত হইতে পারিত।[৪]

২ চৈতালি, চৈত্র ১৩০২-শ্রাবণ ১৩০৩; মালিনী সর্বপ্রথম সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে আত্মপ্রকাশ করে, ১৮৯৬।

৩ পতিতা (কবিতা), সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, গান্ধারীর আবেদন এবং ভাষা ও ছন্দ (কবিতা)।

৪ দ্রষ্টব্য দেবতার বিদায়, পুণ্যের হিসাব, বৈরাগ্য, সামান্য লোক, কর্ম, দিদি, পরিচয়, পুঁটু, সঙ্গী, সতী, স্নেহদৃশ্য, করুণা। এগুলি সমস্তই গল্পের অঙ্কুর।

তারপর ১৮৯৮ (১৩০৫) সালে পাই সাতটি গল্প। এ বছরে কাহিনীমূলক কাব্য আর পাই না, কারণ গল্প বলার ধারাটা আবার গদ্যের খাতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

ইহার প্রধান কারণ, সাধনা বন্ধ হইয়া যাইবার আড়াই বছর পরে ভারতীর সম্পাদনাভার তাঁহার উপর পড়ে। এবারে ভারতীর জন্য গল্পে জোগান দিতে হইতেছে।[৫]

পুনরায় ইংরেজী ১৮৯৯ (বাং ১৩০৬) সালে ছোটগল্প আর পাই না, তার বদলে পাই কথার অনেকগুলি কাহিনীমূলক কবিতা।[৬] আবার স্রোতটা কাহিনীকাব্যের খাতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

অতঃপর ১৯০০ (১৩০৭) সালে পাই আটটি ছোটগল্প। কাহিনী-কাব্যের স্রোত একারে মন্দ। এখন কবিকে দেশের নানা পত্রিকায় গল্প জোগাইতে হইতেছে।

১৯০০ সালে আসিয়া বহুনিন্দিত, বহুপ্রশংসিত ঊনবিংশ শতাব্দী সমাপ্ত হইল। এখানে আসিয়া কবিজীবনের একটি অধ্যায়ে এবং সেই সঙ্গে গল্প রচনার একটি অধ্যায়ে ছেদ পড়িল। অতঃপর দেখিতে পাইব যে, তাঁহার জীবনে আর সেই সঙ্গে তাঁহার ছোটগল্পগুলিতেও নূতন ছায়ালোকপাত হইতে শুরু করিয়াছে।

এখন ১৯০১ সাল, কবির বয়স চল্লিশ বৎসর। ১৯০১ হইতে ১৯১২ সালের মধ্যে সবশুদ্ধ আটটি মাত্র গল্প পাই। এই স্বল্পতার

মাটিতে লালিত হইলে কল্পতরু হইতে পারিত, আকাশে লালিত হওয়াতে আকাশ-কুসুম সৃষ্টি করিয়াছে। এগুলি গল্পের গুটিপোকা হইতে উদ্ভূত রঙীন প্রজাপতি—জাত এক, রূপ আলাদা।

৫ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড পৃ ৩৪৪।

৬ পূজারিনী, অভিসার, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী, অপমান-বর, স্বামীলাভ স্পর্শমণি, বন্দীবীর, মানী, প্রার্থনাতীত দান, রাজবিচার, শেষ শিক্ষা, নকল গড়, হোরি খেলা, বিচারক, পণরক্ষা, বিসর্জন (কাহিনী) প্রভৃতি। এবং কর্ণকুন্তী-সংবাদ, রচিত ফাল্গুন, ১৩০৬।

কারণ কি? কাহিনীমূলক কাব্য এ পর্বে পাই না, তবে গল্পের স্রোতটা গেল কোথায়? গল্পের টুকরাগুলি জমিয়া একজোট হইয়া উপন্যাসের আকার লাভ করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কবি তিনখানি উপন্যাস রচনা করেন, চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা।

তারপর একেবারে ১৯১৪ সাল (১৩২১)। এখন সবুজ পত্রের চাহিদা মিটাইবার জন্য তাঁহাকে গল্প লিখিতে হইতেছে। পাইতেছি সাতটি গল্প। ইহা বলাকা কাব্যেরও পর্ব বটে। বলাকায় নূতন যৌবনের ও নূতন জীবনের যে সুর ধ্বনিত, এ গল্পগুলিতেও তাহারই প্রতিধ্বনি।

১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে ছোটগল্প পাই না, তার বদলে পাই ঘরে-বাইরে এবং চতুরঙ্গ।

১৯১৭ সালে (১৩২৪-এ) পাই তিনটি গল্প। ইহা পলাতকা কাব্যের সময়। পলাতকা কাব্যের প্রধান একটি ভাবসূত্র নারী-জীবনের মূল্য স্বীকার। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ'—পলাতকা কাব্যে ঐ ভাবটিকেই যেন পূর্ণতা দান করিলেন, বলিলেন, মাতা, কন্যা বা বধূ রূপটিই নারীর সম্পূর্ণ রূপ নয়, নারী বলিয়াই তাহার নিজস্ব একটি মূল্য আছে। পলাতকায় আছে—

"আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায়
নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হতো সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হতো কাননে ফুল ফোটা।"

এ-সময়কার এবং কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী বলাকা পর্বের গল্পগুলি এই ভাবেরই যেন ভাষ্যময় রূপ।

ইহার পরে মাত্র পাঁচটি গল্প পাই। একটি ১৯২৫-এ, দুইটি ১৯২৮-এ, একটি ১৯২৯-এ আর শেষেরটি ১৯৩৩ সালে।

কিন্তু এখানেই গল্পধারার শেষ নয়, আছে বিভিন্ন সময়ে লিখিত আরও তিনখানা বই—সে, গল্পসল্প ও তিনসঙ্গী।

সে-র কিম্ভূত রসের গল্পগুলিকে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া বুঝিতে হইবে। গল্পসল্পর পরিপ্রেক্ষণী ছেলেবেলা নামে জীবনকথা, আর তিনসঙ্গীকে বুঝিতে হইলে তাঁহার চিত্রাবলীর ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য বিশ্বপরিচয়ের সাহায্য লইতে হইবে। সে চেষ্টা যথাস্থানে করিব—এখন এই আভাসটুকুই যথেষ্ট।

এইতো হইল রবীন্দ্রনাথের গল্পধারার চৌহদ্দি, দেশ ও কালের একজোট-পাকানো গ্রন্থি। পূর্বোক্ত স্থূল কথাগুলি মনে রাখিয়া এবারে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করিব।

দুই

এবারে যে প্রশ্নটি স্বভাবতই মনে জাগা সম্ভব, তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রসাহিত্যে ছোটগল্পের মর্যাদা স্মরণ রাখিলে, রবীন্দ্রপ্রতিভার যে বিশেষ ধর্মের প্রকাশ গল্পধারায় হইয়াছে তাহার গুরুত্ব বুঝিলে, গান ও কবিতার পরেই ছোটগল্পকে রবীন্দ্রপ্রতিভার যোগ্যতম বাহন স্বীকার করিলে, স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে—তবে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রতিভার একটি স্বক্ষেত্রে পৌঁছিতে তাঁহার এত বিলম্ব হইল কেন? ইতিপূর্বে তিনি কাব্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর রচনায় হাত দিয়াছেন, কিন্তু ছোটগল্পে হাত দেন নাই কেন? একটি সহজ উত্তর এই যে, নাটক, উপন্যাস, কাব্য, কবিতা ও প্রবন্ধাদির ধারা বাংলা সাহিত্যে বহমান ছিল, তিনি সহজেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন; ছোটগল্পের ধারা ছিল না, সে ধারা তাঁহারই সৃষ্টি, কাজেই কিছু বিলম্ব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অন্যান্য সহজ উত্তরের মতোই

ইহাও আংশিক মাত্র সত্য। কবিকর্তৃক পরিত্যক্ত ভিখারিনী গল্পটি বাদ দিলে, ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা লিখিত হয় ১৮৮৪ সালে, তখন কবির বয়স তেইশ বৎসর ; এক বৎসর পরে লিখিত হয় মুকুট গল্পটি। বস্তুত মুকুট ছোটগল্প নয়, ছোট উপন্যাস মাত্র। কি গঠনরীতি, কি বিষয়বস্তু, কোন বিচারেই তাহাকে ছোটগল্প বলা যায় না। সমকালে লিখিত রাজর্ষি উপন্যাসের সঙ্গেই মুকুটের নাড়ীর যোগ—কি বিষয়ে, কি গঠনরীতিতে। অবশ্য ঘাটের কথা ও রাজপথের কথাকে ছোটগল্পের পর্যায়ে ফেলিতে হইবে। কিন্তু রাজপথের কথায় গল্প নাই বলিলেই হয়, উহাকে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত করিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না। ঘাটের কথায় অবশ্য গল্প আছে। কিন্তু এ গল্পটির ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে আসিয়া নবীন লেখক যেন একটা ফসল ফলাইয়া লইয়াছেন। সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য কীর্তন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথের নয় ; ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাস বা সন্ন্যাসীকে লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই করিয়াছেন।[৭] ঘাটের কথার সন্ন্যাসী যেন চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের একটা মিশ্ররূপ, উল্টা দূরবীনে দৃষ্ট বলিয়া আকারে ছোট। আবার পাঠককে সম্বোধন করিয়া গল্প জমানো বঙ্কিমী রীতি, রবীন্দ্র-রীতি নয়। আমার বক্তব্য এই যে, ঘাটের কথাকে তাঁহার প্রথম ছোটগল্প বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সঙ্গে স্বীকার করিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বলিতে যে বস্তু বুঝি, কি বিষয়ে, কি বাচন-রীতিতে ইহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ইহা তাঁহার কীর্তি, কিন্তু স্বক্ষেত্রের কীর্তি নয়। এ সত্য রবীন্দ্রনাথও যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেইজন্যই তার পরে সাত বছরের মধ্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আর পদার্পণ করেন নাই। ১২৯৮ সালে (১৮৯১-এ) যখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর তখন তিনি নিশ্চিতভাবে, নিশ্চিন্তভাবে ছোটগল্পের স্বক্ষেত্রে পদার্পণ

৭ দ্রষ্টব্য মুক্তির উপায়, উদ্ধার, তপস্বিনী।

করিলেন ; সে পদচারণা জীবনের শেষতম বৎসর পর্যন্ত সচল ছিল। এই স্বক্ষেত্রপ্রাপ্তির কিছু ইতিহাস আছে।

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে ক্ষেত্রের ভেদ আছে। উপন্যাসগুলির ক্ষেত্র নাগরিক জীবন, প্রধান পাত্র-পাত্রী প্রায় সকলেই নাগরিক নর-নারী।[৮] আর তাঁহার অধিকাংশ ছোটগল্পের ক্ষেত্র পল্লীজীবন, প্রধান অপ্রধান প্রায় সকলেই পল্লীবাসী।*

এইভাবে নাগরিকবঙ্গ ও পল্লীবঙ্গকে তাঁহার প্রতিভা যেন ভাগ করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার ছোটগল্পের ক্ষেত্র নির্বিশেষ কোন দেশ নয়, তাহাকে মানচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা যায়—এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করিব। তবে শিল্পর হাতের গুণে বিশেষ অনেক স্থানে নির্বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা সজ্ঞান-চেষ্টাকৃত। বিশেষের বীজকে উদ্ভিন্ন করিয়াই সর্বদা মহৎ শিল্পের বনস্পতি উদ্ভূত হয় ; আকাশকুসুমের চাষ বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পল্লীবঙ্গই তাঁহার ছোটগল্পের যথার্থ ক্ষেত্র। যে সময় হইতে তিনি নিয়মিত ছোটগল্প লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই পল্লীবঙ্গের সহিত তাঁহার স্থায়ী পরিচয়ের সূত্রপাত।

রবীন্দ্রনাথ খাস কলিকাতার মানুষ। কিন্তু তাঁহাদের পৈতৃক জীবিকার উপায়টির অবস্থান সুদূর পল্লীবঙ্গে। ইতিপূর্বে তিনি সেখানে অনেকবার গিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে যাওয়া এবং সে দেখা নিতান্তই বাহির হইতে। বিস্তৃত জমিদারীর পরিদর্শনভার গ্রহণ করিয়া সেখানে তিনি গেলেন ১৮৯১ সালে।

"বিলাত হইতে ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে কার্যভার গ্রহণ করিয়া উত্তরবঙ্গে যাত্রা করিতে হইল। গত কয়েক

---

৮ বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি সম্বন্ধে এ কথা খাটিবে না, কারণ তখন তিনি অংশত বঙ্কিমী রীতিকে অনুসরণ করিতেছিলেন।

* শেষ জীবনের ছোটগল্পে কিছু ব্যতিক্রম আছে।

বৎসর হইতে মাঝে মাঝে জমিদারী পরিদর্শনের জন্য স্থানে স্থানে যাইতে হইতেছিল বটে, কিন্তু পরিচালনার ভার কখনো তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় নাই। জমিদারীর তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার অবশেষে রবীন্দ্রনাথের উপরে আসিয়া পড়িল। তখন ঠাকুর এস্টেট সমস্তই এজমালিতে ছিল, সুতরাং খুবই বড় জমিদারী।······ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথকে জীবনের কোন কঠিন দায় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় নাই। সাহিত্যজীবনের বিচিত্র মাধুর্যের মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল বিপুল জমিদারী তদারকের কাজ। কিন্তু কবি হইলেও তাঁহার সহজ বুদ্ধি এত প্রখর ছিল যে, তিনি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে মানাইয়া লইলেন; শুধু মানাইয়া লইলেন না, তাহাকে নিপুণভাবে সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। যেমন নিজের পরিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি ছোটখাটো খুঁটিনাটি কাজকর্ম করিতেছিলেন, তেমন ভাবেই। জীবনের দিক হইতে এই ঘটনাটি খুব বড়। (বাস্তবকে প্রকৃতির সহিত জীবনে মিশাইয়া এমন নিবিড়ভাবে পাইবার সুযোগ ইতিপূর্বে হয় নাই। প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া বিশ্বের সৃষ্টিসৌন্দর্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে জানিয়াছিলেন, মানুষকে তেমন নিবিড়ভাবে জানিতে সুযোগ লাভ করেন নাই।) জমিদারী পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া বাংলার অন্তরের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইল—মানুষকে তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে হৃদয়াবেগের আতিশয্য এ যুগে বহুল পরিমাণে মৃদু হইয়া আসিল; পদ্মা তাঁহার কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় নূতন রস, নূতন শক্তি, নূতন সৌন্দর্য দান করিল।"[৯]

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কবিজীবনের এই ঘটনাটির তাৎপর্য সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আরও কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ ধনী জমিদার, এবং বাহিরের লোক। কাজেই তথাকার পল্লীজীবনের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গভাবে

৯ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, পৃ ২৩২।

মিশিবার উপায় ছিল না। পল্লীজীবনের মধ্যে মিলিত হইবার ইচ্ছা যতই প্রবল হোক, বাধা তুর্লঙ্ঘ্য ; ফলে তাঁহাকে দূর হইতে, বাহির হইতে দেখিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ইহা যেন নদী-স্রোতে ভাসমান নৌকা হইতে তীরভূমির পল্লীকে দর্শন। ইহাই সত্যকার ছোটগল্পের দেখা। এখানকার অভিজ্ঞতা অবিচ্ছিন্ন ধারায় তাঁহার মনে আসে না, আসে খণ্ডশ। সে খণ্ডগুলি এমন ব্যাপক নয় যে, তাহার উপরে উপন্যাসের ইমারত গাঁথা চলে ; সে টুকরা-গুলি ছোটগল্প রচনার মাপে সঙ্কীর্ণ। তার উপর আবার যখন মনে করি যে, ক্ষুদ্র পরিসরে আত্মপ্রকাশ করাই রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশেষ লক্ষণ, তখন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার ইতিহাসটি আভাসে যেন দেখিতে পাই। আবার পল্লীবঙ্গের সাধারণ নরনারীর ছোটখাটো সুখতুঃখের তন্তু যে ইতিহাসের সুদৃঢ় গ্রন্থি রচনার পক্ষে উপযোগী নয়, ইহাও স্বাভাবিক। এখন রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার খণ্ড খণ্ড রূপ, সেই খণ্ড খণ্ড রূপের বিশেষ লক্ষণ এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশেষ ধর্ম—এই তিনটি উপাদানকে একত্র করিয়া মিশাইয়া লইলে কি তৎকালে রচিত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছাই না? আমার তো বিশ্বাস, পৌঁছাই। (তাঁহার অনেক ছোটগল্পের প্রাথমিক খসড়া পাই ছিন্নপত্রে।) চৈতালি পর্বে তিনি ছোটগল্প লেখেন নাই। কিন্তু চৈতালির অনেক কবিতারও প্রাথমিক খসড়া আছে ঐ ছিন্নপত্র গ্রন্থখানাতেই।

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে ও ছোটগল্পে সমগ্র বঙ্গদেশকে যেন নগরবঙ্গে ও পল্লীবঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছেন, এ কথা আগেই বলিয়াছি। তাঁহার ছোটগল্পের ক্ষেত্র পল্লীবঙ্গকেও যেন আবার তুটি ভাগ করা সম্ভব। (পল্লীবঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে আছে মানুষ ও প্রকৃতি, জনপদ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ; একদিকে গ্রাম ও ছোটখাটো সব শহর, আর একদিকে নদ-নদী, বিলখাল, শস্যহীন ও শস্যময় প্রান্তর, আর সবচেয়ে বেশি করিয়া আছে রহস্যময়ী পদ্মা। মোটের

উপরে বলিলে অন্যায় হইবে না যে, এই পর্বে লিখিত কাব্য-কবিতার রসের উৎস এই প্রকৃতি, আর ছোটগল্পগুলির রসের উৎস এইসব জনপদ। কবিতায় প্রতিধ্বনি নদনদীর, ছোটগল্পে প্রতিচ্ছবি জনপদগুলির।) এই স্থূল ভাগ সত্য হইলেও একেবারে ওয়াটার-টাইট বা জল-অচল ভাগ নয়। এক ভাগের রেশ অপর ভাগে আসিয়া পড়িয়াছে, তাই (ছোটগল্পে পাইব প্রাকৃতিক স্পর্শ আর কবিতায় পাইব মানবিক স্পর্শ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, তাঁহার সাহিত্যে যেন দুটি আকাঙ্ক্ষা আছে—সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানব-সমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, আবার নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকে উধাও হইয়া পড়িবার আকাঙ্ক্ষা।) পূর্বোক্ত ভাগ যেন সেই দুটি আকাঙ্ক্ষার আশ্রয়। (ছোটগল্পগুলির মধ্যে পাই সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানব-সমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা,) আর তৎকালীন কবিতায় পাই—বিশেষ সোনার তরী ও চিত্রার ন্যায় কাব্যে—নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকে উধাও হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আবার বলিয়া রাখি যে, এ দুই ভাগও ওয়াটার-টাইট বা জল-অচল ভাগ নয়। এই পর্বে রচিত কাব্য ও ছোটগল্প মিলাইয়া পড়িলে তবেই কবির তৎকালীন মনোধর্মের সমগ্র রূপটি, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র লীলাটি উপলব্ধি হইবে। ছোটগল্প আলোচনার সময়ে আমরা সেই পন্থাই অবলম্বন করিব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"সেই সময়ে (এই পর্বটায়) আমি প্রথম অনুভব করেছিলুম যে, বাঙলা দেশের নদীই বাঙলা দেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে।"[১০]

আবার জাভাযাত্রীর পত্রে তিনি বলিয়াছেন—

"বাঙলা দেশের পল্লীতে সন্ধ্যাবেলায় চাঁদ উঠেছে, অথচ গান ওঠে নি, এমন কখনো হয় না।"

১০ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, পৃ ১০৩।

এই দুটি উক্তি মিলাইয়া লইলে পাই নদীর গানে আর মানুষের গানে বাংলার সমগ্র বাণীরূপ। এই সমগ্র বাণীরূপের আধার তাঁহার কাব্য ও ছোটগল্প। ছোটগল্পই এখানে আলোচ্য বিষয় সত্য, কিন্তু যেহেতু সত্য মানেই সমগ্র রূপ এবং যেহেতু সমগ্র রূপের সন্ধানেই আমরা বহির্গত, ছোটগল্পগুলিকে সমকালীন কবিতার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া আলোচনা করিব। আশা করি, কিছু সুফল পাওয়া যাইবে।[১১]

তিন

রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসের মতো রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি ভূগোল কল্পনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূগোল সাধারণভাবে বাঙলা দেশ, কিন্তু ঐ সাধারণ পরিচয়টাই যথেষ্ট নয়, বিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক।

জমিদারীর ভার গ্রহণ করিবার আগে সাধারণভাবে বাঙলা দেশ হইতে তিনি রচনার উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ১৮৯১ সালে যখন স্থায়িভাবে জমিদারীর ভার গ্রহণ করিলেন, একটি বিশেষ ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তথাকার মানবসমাজকে তিনি জানিবার সুযোগ পাইলেন। এই সুযোগ প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করিল

১১ রবীন্দ্রনাথের ও পরবর্তীদের ছোটগল্পে প্রধান প্রভেদ এই যে, পরবর্তীদের ছোটগল্প সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার, তাহাতে অনাবশ্যক তথ্যকে বাদ দেওয়াই প্রধান সমস্যা; আর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অপূর্ণ অভিজ্ঞতার আভাস, অজ্ঞাত তথ্যকে সৃষ্টি করাই সেখানে প্রধান সমস্যা; রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কেন এমন হইল তাহা আগে বলিয়াছি। তথ্যের অপূর্ণতাকে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণে কল্পনার মিশল দিতে হইয়াছে। খুব সম্ভব এইজন্য অনেকে তাঁহার অনেক ছোটগল্পকে 'লিরিকধর্মী' বলিয়া থাকেন। পরে এ বিষয়ে আলোচনা করিব, এখন প্রসঙ্গান্তর।

তাঁহার গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি সমস্ত রচনায়। অত্যল্প কাল মধ্যে তাঁহার সমস্ত রচনায় এমন একটা প্রৌঢ়তা ও পরিণতি দেখা গেল, যাহা কেবল বয়োধর্মের দ্বারা ব্যাখা করা যায় না। প্রকৃতি ও মানুষের বিশেষ রূপের দ্বারা তাহা সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ। সার্থক শিল্পে বিশেষ সর্বদাই নির্বিশেষ হইয়া উঠিবার মুখে। এখানেও তাহাই ঘটিল। বাঙলা দেশের দুইটি ভূখণ্ড তাঁহাকে এই বিশেষের রস জোগাইয়াছে। যে-সময়কার কথা বলিতেছি, তখনকার ভূখণ্ডকে মধ্যবঙ্গ বলা যাইতে পারে। আর তাঁহার শেষবয়সে বিশেষের রস জোগাইয়াছে রাঢ়বঙ্গ। এই দুই পর্বে রচিত রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও চিত্রে প্রভেদ সুস্পষ্ট। খেয়া ও গীতাঞ্জলি প্রভৃতির বহুতর কবিতার মধ্যে রাঢ়বঙ্গের শাল তালের মিশ্রিত মর্মর ধ্বনিত; তেমনি ক্ষণিকা ও চৈতালির মতো কাব্যে মধ্যবঙ্গের পল্লীপ্রকৃতির চিত্র ও সঙ্গীত সুনিপুণভাবে অঙ্কিত; একের সঙ্গে অন্যের ভুল হইবার উপায় নাই। প্রথম পর্বের আগে তাঁহার কাব্যে যে প্রকৃতিকে পাই, তাহা নিতান্তই নির্বিশেষ।[১২] এই বিশেষের স্বাক্ষর তাঁহার চিত্তে এমন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, অতঃপর তিনি যেখানেই যান না কেন, সমস্ত দৃশ্যেই ঐ বাঙলা দেশকেই মনে পড়িয়া গিয়াছে।[১৩]

যাযাবর মানুষের সাহিত্য নাই, কারণ যাযাবর মানুষ ভ্রাম্যমাণ; আর ভ্রাম্যমাণ বলিয়া, নিত্য নব নব ভূখণ্ডে সঞ্চরণমাণ বলিয়া তাহার মন বিশেষের রসাভিষেক হইতে বঞ্চিত থাকে। মানুষ যখন কৃষিকর্ম গ্রহণ করিল তখন হইতে সে বিশেষের ভূপ্রকৃতির অঞ্চলে বাঁধা পড়িল, তখনই তাহার শিল্প ও সাহিত্যেরও সূত্রপাত হইল। কৃষি ও কৃষ্টি একই ধাতুজাত।

---

১২ মানসীর কয়েকটি কবিতায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। এই সব কবিতায় উত্তর বিহারের বিশেষ চিত্র পাওয়া যাইবে।

১৩ দ্রষ্টব্য "চিঠি", পূরবী।

প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্য একান্তভাবে আঞ্চলিক সৃষ্টি। হোমারও তাই, এথেন্সের নাট্যকাব্যও তাই, আবার থিওক্রিটাসের কাব্যও তাই। বিশেষ ভূখণ্ডের জীবনরস হইতে বঞ্চিত যে মানুষ, সেই "city-less man"কে সোফোক্লিস হতভাগ্য মনে করিতেন; শুধু তাহাই নয়, তিনি মনে করিতেন, সে রকম মানুষ সমাজের পক্ষে একটা অভিশাপস্বরূপ। গ্রীস যতদিন প্রাণবন্ত ছিল, তাহার অধিবাসিগণ কেবল মানুষ ছিল না, বিশেষ 'পুরী'র বা বিশেষ "city state" এর মানুষ ছিল।

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য, বোধ করি প্রাচীন সব সাহিত্যই, প্রধানত আঞ্চলিক সাহিত্য। প্রধান প্রধান বৈষ্ণব পদকর্তাগণের নাম ধাম সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা অনতিবিস্তৃত এক ভূখণ্ডের মানুষ ছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য ও মনসামঙ্গল কাব্যগুলিরও ভূখণ্ড নির্দিষ্ট করা চলে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের ভূখণ্ডের বিবরণ আমরা জানি। পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলিও বিশেষ ভূখণ্ড হইতে উদ্ভূত।*

অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, অঞ্চলবিশেষে সৃষ্টি হইলেই সে-রচনা আঞ্চলিক হইতে বাধ্য, তাহা সর্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে না। ইতিহাসের নজীর ইহার প্রতিকূল। সার্থক আঞ্চলিক সাহিত্যই শেষ পর্যন্ত সর্বজনের রস-চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হয়। মূল গ্রীস ভূখণ্ডে সভ্যতার অবনতি ঘটিলে পরে তৎকালীন ভূমধ্য-সাগরের ঔপকূলিক দেশসমূহে যে গ্রীক সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, দু'চারিটি ছাড়া তাহার কোন সাহিত্যিক নমুনা যে টিকিয়া নাই, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, বিশেষের রসের দ্বারা সে-সাহিত্য পুষ্ট ছিল না, সন্ধ্যাকাশের সোনার ফসল সূর্যাস্তের সঙ্গেই রাত্রির অন্ধকারে বিলীন

* এই ধারা এখনও লোপ পায় নাই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য আধুনিক লেখকের অনেক উপন্যাস ও গল্প আঞ্চলিক সৃষ্টি।

হইয়া গিয়াছিল। বীজের মধ্যে বনস্পতির ন্যায় বিশেষের মধ্যেই নির্বিশেষ আছে। নির্বিশেষ অভাবাত্মক নয়, তাহার অপর নাম সর্বজনীনতা। বহু দূরাগত ঘটনাপরম্পরার ধাক্কায় আমরা এখন এমন অবস্থায় পৌছিয়াছি যে, বিশেষের গ্রন্থিবন্ধন ছিন্ন হইতে চলিল প্রায়। এখন আমরা দেশ বলিতে, সমাজ বলিতে যাহা বুঝি, তাহা অস্পষ্ট এক সত্তা, তাহা হয়তো বুদ্ধিগম্য, কিন্তু হৃদয়গম্য নিশ্চয়ই নয়। আর্কিমিডিস বলিয়াছিলেন, পা রাখিবার একটু জায়গা পাইলে পৃথিবীটাকে তিনি বিচলিত করিতে পারিতেন। আমাদের সে পা রাখিবার জায়গাটুকুরই অভাব ঘটিয়াছে, নিজের উপরে তো নিজের দাঁড়ানো চলে না। যেখানে দাঁড়াইতে পারিলে স্থিরমস্তিষ্কে সুস্থভাবে জগৎকে দেখিতে পারা যায়, এইরূপ দাঁড়াইবার জায়গাকেই বিশেষ ভূখণ্ড বা বিশেষ অঞ্চল বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

আমাদের সৌভাগ্যবশত বর্তমান যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও রবীন্দ্রনাথ ঘটনাচক্রে এইরূপ একটি অঞ্চলের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার ধনী অভিজাত ঘরের ছেলে, দূর পল্লীগ্রামে গিয়া স্থায়ী হইবার কথা তাঁহার নয়, কিন্তু ঘটনার টানে তাহাই ঘটিয়া গেল। ইহার শুভ পরিণামের জন্য এই অঘটনের কাছে বাঙালী পাঠকমাত্রেই ঋণী।

রবীন্দ্রসাহিত্যামোদী পাঠকের পক্ষে এই ভূখণ্ডের প্রতি কৌতূহল স্বাভাবিক মনে করিয়া তাহার কিছু বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের পৈতৃক জমিদারীর প্রধান অংশ নদীয়া, পাবনা ও রাজসাহী জেলাতে।[১৪]

---

১৪ ইহা ছাড়া যশোহর ও ফরিদপুর জেলাতেও কিছু আছে। উড়িষ্যায় যে জমিদারী আছে সেখানে কবির ভ্রমণের বর্ণনা ছিন্নপত্র গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এখানে জেলার যে পরিচয় প্রদত্ত হইল তাহা অখণ্ড বাংলার মানচিত্রানুযায়ী।

শিলাইদহের কুঠিবাড়ি কবিতীর্থে পরিণত হইয়াছে। শিলাইদহ গ্রামটি বিরাহিমপুর পরগনার সদর কাছারি। ইহা নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমায় অবস্থিত। সাহাজাদপুর আর একটি পরগনা—ইহার অবস্থান পাবনা জেলার নওগাঁ মহকুমায়। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, নদীয়া, পাবনা ও রাজসাহী জেলাত্রয়ের কতক অংশ ব্যাপিয়া এই জমিদারীর অবস্থান।

ছিন্নপত্র গ্রন্থের পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শিলাইদহ, সাহাজাদপুর ও পতিসরের মধ্যেই কবির চলাচলের প্রধান পথ। চলাচলের সময় ছাড়াও অনেক সময়ে তিনি পদ্মাবক্ষে বোটে বাস করিতেন।[১৫]

কবি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পেশা জমিদারী হইলেও নেশা আসমানদারীতে। বর্তমান ক্ষেত্রে জমিদারী ও আসমানদারী এমন মিশিয়া গিয়াছে যে, দু'য়ে ভেদ করা কঠিন; আর সেইজন্যই সাহিত্য-সমালোচনা লিখিতে বসিয়া জমিদারীর বিবরণ দিতে হইতেছে।

এই ভূখণ্ডকে মধ্যবঙ্গ বলিয়াছি। ইহার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ভূপ্রকৃতির মিল আছে, কিন্তু রাঢ়বঙ্গ হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানচিত্রের ভাগ অনুসারে ইহা পূর্ববঙ্গও বটে, আবার উত্তরবঙ্গও নিশ্চয়। বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলময় হইয়া গিয়া পৃথিবীর ভূগোল-পরিচয় প্রকাশ করে—তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। নদী নালা বিল ইহার জলভাগ, আর বর্ষাজলের স্ফীতির উর্ধ্বে অবস্থিত গ্রামগুলি এবং অনন্ত শস্যক্ষেত্র ইহার স্থলভাগ। পদ্মা প্রধান নদী, অবশ্য যমুনাও (ব্রহ্মপুত্র) কম নয়; আর আছে আত্রেয়ী, নাগর,

---

১৫ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অবিলম্বে ছিন্নপত্রের একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশ করা উচিত, যেমন, তাঁহারা জীবনস্মৃতি গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন। জমিদারী মধ্যে কবির প্রধান চলাচলের পথের একটি মানচিত্র দিলে পাঠকের সুবিধা হইবে। ছিন্নপত্রের সমকালীন কবির আত্মীয়স্বজন এখনো অনেকে জীবিত আছেন, তাঁহারা টীকা রচনায় সাহায্য করিতে পারিবেন মনে হয়।

বড়ল, গৌরাই (গৌরী নদী) ও ইছামতী প্রভৃতি নদনদী। আর রাজসাহী জেলা ও পাবনা জেলার একাংশ ব্যাপিয়া অনির্দিষ্ট-আকার চলনবিল, তাহাও অগ্রাহ্য করিবার মতো নয়। রবীন্দ্রনাথের চোখে এই বিচিত্র ভূখণ্ড মানবজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিণত জীবনচিত্র যেন উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—ইহার নিজস্ব মূল্য যাহাই হোক, এখানেই ইহার আসমানদারীর সার্থকতা। সত্য কথা বলিতে কি, ঐ সূত্রে এই ভূখণ্ড রবীন্দ্রসাহিত্যের পাদটীকায় আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে।

এই ভূখণ্ডের কথা যখন ভাবি, বিস্ময়ের অন্ত থাকে না ; মনে হয়, মধ্যবঙ্গে অবস্থিত এই ভূখণ্ডে বঙ্গের মধ্যেকার কোন্ সত্য যেন প্রকাশিত হইয়াছে। মনে হয়, সিংহবাহিনী পদ্মা পরিপূর্ণ বিজয়-গৌরবে আপন বামচরণ চলনবিল-রূপী ঐ কালো অসুরটার স্কন্ধের উপর স্থাপন করিয়াছেন আর তাঁহাকে ঘিরিয়া আত্রেয়ী এবং গৌরী, বড়ল এবং নাগর নদনদীসমূহ বাঙালী-জীবনের ধ্যানের বিচিত্রপূর্ণতাকে যেন প্রকাশ করিয়াছে। এ হেন ভূখণ্ড কবি-প্রতিভার যোগ্য ধাত্রী বটে! এই ভূপ্রকৃতি যেন ষড়্‌মাতৃকার মতো কবিকে স্তন্যদান করিয়াছে—আর তাই বুঝি কবিও প্রতিভার ষড়্‌মুখে জননীর ঋণ শোধ করিয়াছেন।

(এই ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অংশের প্রধান নায়ক পদ্মা, আর জনপদ অংশের প্রধান নায়ক অখ্যাত অজ্ঞাত মানব।) কবিজীবনে পদ্মার প্রভাব সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি—এখানে আবার করা যাইতে পারে। পরবর্তী কালে সূর্যের মধ্যে কবি "আমার সত্যের ছবি" দেখিয়াছেন—

> "তোমার হোমাগ্নি মাঝে
>
> আমার সত্যের আছে ছবি,
>
> তারে নমো মম।"[১৬]

---

১৬ সাবিত্রী, পূরবী কাব্য।

কিন্তু যে পর্বের কথা বলিতেছি তখন যেন তিনি পদ্মার প্রবাহে আপন "সত্যের ছবি" দেখিয়াছিলেন। পদ্মাকে এমন সহস্রভাবে, সর্বতোভাবে আর কোন কবি দেখেন নাই, উপলব্ধি করেন নাই—এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

কবি লিখিতেছেন—

"আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি, তাহ'লে নদীর স্রোতে সেটা পাওয়া যায়। মানুষ পশুর মধ্যে যে চলাচল, তাতে খানিকটা চলা, খানিকটা না চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে, সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের চেতনার সঙ্গে, তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়।...সেইজন্যে এই ভাদ্র মাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়; সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে-চুরছে, এবং চলেছে; মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসঙ্গীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্রশস্যশালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো।"[১৭]

এই ভাবটিই যে পরবর্তী-কালে লিখিত বলাকা কাব্যের চঞ্চলা কবিতার ভাবাত্মক নদীতে পরিণত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু কবির কাছে পদ্মা কেবল অশরীরী ভাবমাত্র নয়—এমন একটি দিব্য শরীরী সত্তা যাহার সঙ্গে সহজেই হৃদয়ের আত্মীয়তা স্থাপিত হইতে পারে—হইয়াছেও তাই। পদ্মা একটি আইডিয়া মাত্র হইলে তাহাকে লইয়া তত্ত্ব রচনা চলিতে পারিত, কিন্তু কাব্যের বস্তু হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ।

কত রকমেই না কবি পদ্মাকে উপলব্ধি করিয়াছেন।

১৭ কুষ্টিয়ার পথে, ২৪শে আগস্ট, ১৮৯৪, ছিন্নপত্র।

"কাল খানিক রাত্রে জলের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা তুমুল কল্লোল এবং প্রবল চঞ্চলতা উপস্থিত হয়েছে। বোধ হয় অকস্মাৎ একটা নতুন জলের স্রোত এসে পড়েছে। রোজই প্রায় এই রকম ব্যাপার ঘটছে।···ঠিক যেন আমি সমস্ত নদীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছি। কাল অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা চঞ্চল উচ্ছ্বাস এসে নাড়ীর নৃত্য অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল।" [১৮]

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, পদ্মা যেমন একটি ভাবমাত্র নয়, তেমনি মানবসম্পর্কবিচ্ছিন্ন একটি বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক সত্তা মাত্রও নয়। তাহার তরঙ্গাভিঘাতে কবিচিত্তে অনেক মানবসত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নদীস্রোতে ভাসমান একটি মৃত পাখীর দেহ দেখিয়া কবি বলিতেছেন—

"আমি যখন মফস্বলে থাকি, তখন একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে নিজের সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর বলে উপলব্ধি হয়। শহরে মনুষ্যসমাজ অত্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে। সেখানে সে নিষ্ঠুরভাবে আপনার সুখদুঃখের কাছে অন্য কোনো প্রাণীর সুখদুঃখ গণনার মধ্যেই আনে না। য়ুরোপেও মানুষ এত জটিল ও এত প্রধান যে, তারা জন্তুকে বড় বেশি জন্তু মনে করে। ভারতবর্ষীয়েরা মানুষ থেকে জন্তু ও জন্তু থেকে মানুষ হওয়াটাকে কিছুই মনে করে না; এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে সর্বভূতে দয়াটা একটা অসম্ভব আতিশয্য বলে পরিত্যক্ত হয় নি। মফস্বলে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে সেই আমার ভারতবর্ষীয় স্বভাব জেগে ওঠে। একটি পাখীর সুকোমল পালকে আবৃত স্পন্দমান ক্ষুদ্র বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল, তা আর আমি অচেতনভাবে ভুলে থাকতে পারি নে।"[১৯]

পদ্মা-প্রবাহকে অনুসরণ করিয়া এক দিকে কবি যেমন মানব-

---

১৮ ১০ই আগস্ট, ১৮৯৪, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র।

১৯ ৯ই আগস্ট, ১৮৯৪, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র।

সংসারের দিকে আসিয়া পড়েন, আর এক দিকে তেমনি চলিয়া যান বিরাট বিশ্বের মধ্যে, পদ্মা যেন এ দু'য়ের মধ্যে দৌত্য করিতেছে।

"যে দিকে ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়ে সকালবেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে সে দিকে অপার পদ্মা-দৃশ্যটি বড় চমৎকার হয়েছে। জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি ম্লানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা উদিত হয়ে নীরব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে; আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মতো ভ্রূকুটি করে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে; সে যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে কিন্তু এখনো পোষ মানে নি, দিগন্তের এক কোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে।"[২০]

পদ্মা যেমন একটি ভাব, যেমন একটি ভাবমূর্তি, তেমনি বা ততোধিক একটি লৌকিক সত্তা, নতুবা তাহার সঙ্গে কবির হৃদয়-বিনিময় সম্ভব হইত না; আর এই হৃদয়-বিনিময়ের ফলেই পদ্মা কাব্যের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে, অন্যথা তত্ত্বের বহিরঙ্গনেই পড়িয়া থাকিত।

"এতদিন সামনে ঐ দূর গ্রামের গাছপালার মাথাটা সবুজ পল্লবের মেঘের মতো দেখা যেত, আজ সমস্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। ডাঙা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মতো অল্প অল্প করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে। লজ্জার সামা উপছে এলো ব'লে—প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে।"[২১]

এবার স্পষ্টাক্ষরে লিখিত কবির স্বীকারোক্তি উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

"বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড় ভালোবাসি।...এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে, বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে, একটি

২০ ৫ই আগস্ট, ১৮৯৪, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র।

২১ ৩রা জুলাই, ১৮৯৩, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র।

পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে, আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো, অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লেখবার অযোগ্য মনে করা উচিত হবে না।"[২২]

ভালোবাসিলেই সঙ্গে ভয় আসিতে বাধ্য ; কবি আশঙ্কা করেন হয়তো এমন দিন আসবে যখন পদ্মা আর তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না ; কিংবা আরও বড় আশঙ্কার কারণ, তাঁহার নিজেরই মনের এমন পরিবর্তন ঘটিবে যখন পদ্মার এই মাধুর্য তাঁহার চিত্তকে আর এমন-ভাবে আকর্ষণ করিবে না।"[২৩]

কবি বলিতেছেন—

"হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যেবেলা আর কখনো ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্য-পরিবর্তন হবে, আর কি রকম মন নিয়েই বা জন্মাব! এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকব! আশ্চর্য এই, আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।"[২৪]

আবার—

"আজকের আমার এই একলা বোটের দুপুরবেলাকার মনের ভাব, এই একটা কুঁড়েমি সেই কয়েকখানা পাতার [কবির জীবন-চরিত] মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হয়ে থাকবে। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মাতীরের নিস্তব্ধ বালুচরের উপরকার নির্জন মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত ও

---

২২ মে, ১৮৯৩, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র।

২৩ দ্রষ্টব্য "পদ্মা" চৈতালি কাব্য।

২৪ ১৬ই মে, ১৮৯৩, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র।

অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি অতি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে ?"[২৫]

উপরিলিখিত খণ্ডাংশগুলির সঙ্গে মূল গ্রন্থ ছিন্নপত্র মিলাইয়া পড়িলে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকিবে না যে, পদ্মা কবির কাছে কতখানি সত্য—নদীমাত্র রূপে নয়, ভাব বা ভাবমূর্তিমাত্র রূপে নয়, একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লৌকিক সত্তা রূপে। এই কথাটি বেশ স্পষ্ট করিয়া না বুঝিলে এই পর্বের কাব্যবোধ অসম্পূর্ণ থাকিবে, ছোটগল্প-গুলিরও রহস্যোদ্ধার হইবে না।

এই পর্বের গল্প ও কবিতা পরস্পরের সান্নিধ্যে যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য দু'য়ে মিলাইয়া পড়া আবশ্যক; এ দু'য়ের মধ্যে চলাচলের পথ বিদ্যমান, পদ্মাই সেই চলাচলের পথ।

আর জনপদ অংশের প্রধান নায়ক অখ্যাত অজ্ঞাত মানব এ কথার উল্লেখ আগে করিয়াছি। অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষের সাক্ষাৎ নব্য বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম পাইলাম রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে। ইতিপূর্বে মধুসূদন বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাগণকে আঁকিয়াছেন, তাঁহারা রামায়ণ-মহাভারতের মাপের মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাদের আঁকিয়াছেন তাঁহাদেরও অনেকের স্থান ইতিহাসের বড় দরবারে, অন্যেরাও সাধারণ মাপের চেয়ে বড়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে যাহাদের পাইলাম তাহারা স্বতন্ত্র জাতের মানুষ; ইতিহাসে পুরাণে তাহাদের উল্লেখ নাই, কাব্যের পাকা বুনিয়াদ তাহাদের জন্য নয়; তাহারা সংসারের নামগোত্রহীনের দল, তাহারা কল্পনারাজ্যের হরিজন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মাঝে মাঝে তাহাদের দেখা পাই। কবিকঙ্কণ উপদ্রুত পশুগণের কাহিনী লিখিবার সময়ে ইহাদের কথাই ভাবিতেছিলেন; আবার ময়মনসিংহ-গীতিকার বাঁশের বাঁশিতে ইহাদেরই সুখ-দুঃখের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। নব্য বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি কলিকাতার মতো

২৫ ১৬ই ফাল্গুন, ১৮৯৫, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র।

শহরে, সেখানে এই নামগোত্রহীনের প্রবেশপথ সঙ্কীর্ণ বলিয়া প্রাক্‌রবীন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে ইহাদের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। এ কথা রবীন্দ্রনাথও জানিতেন।

তাঁহার ছোটগল্পের লিরিক অপবাদ খণ্ডন উপলক্ষ্যে কবি লিখিতেছেন—

"অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখেছি, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন কবি এত লেখেন নি, কিন্তু আমার অবাক লাগে, তোমরা যখন বল যে, আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কি না-জানি দশা হবে। কিম্বা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গানজাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলব, আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা-কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রতক্ষ্য অভিজ্ঞতা।...গল্পে যা লিখেছি, তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে।...ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী-সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"[২৬]

বিষয়টি তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ করেন, তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেবার সময় এলো।...এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা

২৬ রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৫৩৮-৬৩৯।

করে এসেছি। আমার বিশ্বাস, এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লী-জীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয়, এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অ-সাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় হয়, তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে, তাই ভয় হয়, এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।"[২৭]

এই গল্পগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে 'সমাজ-চৈতন্য' নাই, এমন উক্তি নিশ্চয় কবির কানে গিয়াছিল, নতুবা কেন তিনি বলিবেন—

"সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল, নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লী-পার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে, কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।"[২৮]

২৭ রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৫৩৭-৫৩৮।

কবির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে চলিয়াছে, বুর্জোয়া সংসর্গ দোষে গল্পগুচ্ছ অপাঙ্‌ক্তেয় হইবার উপক্রম হইয়াছে।

২৮ র-র ১৪শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৫৪০। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য "খেয়া", "দুর্লভ জন্ম", "সামান্য লোক" প্রভৃতি কবিতা, "চৈতালি" কাব্য। সাহিত্যে 'সমাজ-চৈতন্য' সম্পর্কিত প্রশ্নটির যথোচিত মীমাংসা কবি করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু যাহাদের না বুঝিবার শক্তি অসীম, খুব সম্ভব তাহাদের পক্ষে ইহা যথেষ্ট মনে হইবে না।

উদ্ধৃতিগুলির নির্গলিতার্থ করিলে দাঁড়ায় এই যে, বাংলা সাহিত্যে অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষের ইহাই প্রথম নিঃসংশয় পদার্পণ। আর এ মানুষ কবির মনগড়া নয়—বাস্তব অভিজ্ঞতার সূত্রে প্রাপ্ত। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে মূল উপাদানস্বরূপ ব্যবহার করিয়া তিনি জীবনের লীলা-বিচিত্র রূপটিকে সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ছিন্নপত্র গ্রন্থখানি অবধানপূর্বক পড়িলে কবির দাবির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিবে না, ইহার পত্রে কবির অনেক গল্প ও কবিতার একমেটে রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে, আর সেই একমেটে অভিজ্ঞতা কিভাবে শিল্পবস্তুতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে, সেই বিবর্তনও অনায়াসে লক্ষ্যগোচর হইবে। কবি-জীবনের এই পর্বকে জানিবার পক্ষে বইখানা একেবারেই অপরিহার্য।

পল্লী-অভিজ্ঞতার ভাসমান সব খণ্ড কবি-চিত্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, করিয়া তাঁহার জীবনকে বিচিত্রতর ও পূর্ণতর করিয়া তোলে। তিনি কুঠিবাড়ির ছাদ হইতে কিংবা বোটের জানালা হইতে দেখিতে পান—

"এই নৌকো-পারাপার দেখতে বেশ লাগে। ওপারে হাট, তাই খেয়া-নৌকোয় এত ভিড়। কেউবা ঘাসের বোঝা, কেউবা একটা চুপড়ি, কেউবা একটা বস্তা কাঁধে করে হাটে যাচ্ছে এবং হাট থেকে ফিরে আসছে—ছোট নদীটি এবং দুই পারের দুই ছোট গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় এই একটুখানি কাজকর্ম, মনুষ্যজীবনের এই একটুখানি স্রোত, অতি ধীরে ধীরে চলছে।"[২৯]

আবার কখনো বা গ্রামের ঘাটে বধূ-বিদায়ের একটি দৃশ্য দেখিতে পান—

"অবশেষে যখন যাত্রার সময় হ'ল তখন দেখলুম, আমার সেই চুলছাঁটা, গোলগাল হাতে বালা-পরা, উজ্জ্বল সরল মুখশ্রী মেয়েটিকে

২৯ ২৩শে জুন, ১৮৯১, সাজাদপুর, ছিন্নপত্র

নৌকোয় তুললে। বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে।"[৩০]

এই চিত্রখণ্ড কবিচিত্তে সঞ্চিত হইয়া থাকে, সময়মতো হয়তো 'সমাপ্তি' গল্পাকারে প্রকাশিত হইয়া আসিবে।

আবার পূজার প্রারম্ভে আর একটি চিত্রখণ্ড দেখিতে পান, প্রবাসী ঘরে ফিরিতেছে—

"দেখলুম, একটি বাবু ঘাটের কাছাকাছি নৌকো আসতেই পুরোনো কাপড় বদলে একটি নূতন কোঁচানো ধুতি পরলে; জামার উপর সাদা রেশমের একখানি চায়না কোট গায়ে দিলে, আর একখানি পাকানো চাদর বহুযত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে, ছাতা ঘাড়ে করে গ্রামের অভিমুখে চলল।"[৩১]

পল্লীজীবনের সরল এই সব আভাস কবিচিত্তে একটি তত্ত্বের ইঙ্গিত দেয়—

"যতই একলা আপনমনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায়, ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না।"[৩২]

এই সরলতার শিক্ষা কবির ছোটগল্প রচনার টেকনিকের উপরে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার মতো।

আবার কখনো কখনো ক্ষুদ্র পল্লীজীবনের আভাস একটা প্রকাণ্ড পটভূমিকায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া কবিচিত্তকে কেমন বিকল করিয়া দেয়, ছোটগল্পের সামগ্রী হঠাৎ মহাকাব্যের ভূমিকা গ্রহণ করে—

"আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম, ঘাটে মেয়েরা

---

৩০ ৪ জুলাই, ১৮৯১, সাজাদপুর, ছিন্নপত্র।

৩১ অক্টোবর, ১৮৯১, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র।

৩২ ১৬ই জুন, ১৮৯২, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র।

উলু দিচ্ছে। শুনে মনটা কেমন ঈষৎ বিকল হয়ে গেল, অথচ তার কারণ ভেবে পাওয়া শক্ত। বোধ হয় এই রকমের একটা আনন্দ-ধ্বনিতে হঠাৎ অনুভব করা যায়, পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে, যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার যোগ নেই, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম, সুখ-দুঃখ, উৎসব-আনন্দ চলছে। কী বৃহৎ পৃথিবী! কী বিপুল মানবসংসার!"[৩৩]

"সন্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ওপার থেকে জনকতক লোক বাঁয়া-তবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, ভিন্ন রাস্তা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ যারা চলেছে, তাদের ব্যস্ত ভাব;··· গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে, খেয়াঘাটে নানাশ্রেণীর লোকের ভিড়।···বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালো-মন্দ, সমস্ত সুখ-দুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগম্ভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগলো। আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম।"[৩৪]

এই উক্তিটি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সময়কার কবিতা ও ছোটগল্পের মূল উপাদান প্রায় অভিন্ন, কেবল মনের গতিক অনুসারে কখনো ছোটগল্প, কখনো কবিতা হইয়া উঠিয়াছে।

ছিন্নপত্র হইতে পল্লীর দুটি চিত্রখণ্ড উদ্ধার করিয়া দিতেছি—এই জাতীয় পল্লীচিত্র তাঁহার ছোটগল্পে অবিরল।

"ছোটখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের ছাতওয়ালা বাজার, বাঁখারির বেড়া-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম, কাঁঠাল, খেজুর, শিমুল, কলা, আকন্দ, ভেরেণ্ডা, ওল, কচু, লতাগুল্ম-তৃণের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে-বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকোর দল,

---

৩৩ ২২ জুন, ১৮৯২, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।

৩৪ জুলাই, ১৮৯৪, ছিন্নপত্র।

নিমগ্নপ্রায় ধান এবং অর্ধমগ্ন পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত এঁকেবেঁকে কাল সন্ধ্যের সময় সাজাদপুরে এসে পৌঁচেছি।”[৩৫]

আবার—

“যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা-লতা-গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট-পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেটমোটা পা-সরু রুগ্‌ণ ছেলেমেয়েরা যেখানে-সেখানে জলে-কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়—তখন সে দৃশ্য কোনমতেই ভালো লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না—এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়!”[৩৬]

গল্পগুচ্ছের তলে তলে এইরূপ একটি অশ্রুকরুণ অন্তঃসলিলা ধারাও বর্তমান।

এই-সব ঝাপসা দেখার মধ্যে হঠাৎ এক-একটি চিত্র স্পষ্টভাবে ভাসিয়া ওঠে—

“এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম! বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তারক ভক্তিতে এ-লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো। আমিই যেন এ-ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ-ভক্তিটি তো বড়ো সামান্য জিনিস নয়।”[৩৭]

৩৫ ৭ জুলাই, ১৮৯৩, সাজাদপুর, ছিন্নপত্র।

৩৬ ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, দিঘাপতিয়া জলপথে, ছিন্নপত্র।

৩৭ ১১ মে, ১৮৯৩, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র।

এই রকম লোকের মুখে কবি যেন পল্লী-সংসারকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পান ; ইহার সরল ব্যক্তিত্বে সমষ্টির অস্পষ্ট নীহারিকা হঠাৎ নক্ষত্রের ব্যষ্টিগত উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়।

ছিন্নপত্র বইখানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার এলবাম, কতরকম ছবি, কত রকম মানুষই না এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। সে সমস্ত উল্লেখ করিতে হইলে সমস্ত বইখানাকে উদ্ধার করিয়া দিতে হয়। সে রকম অসম্ভবে প্রবৃত্ত না হইয়া ছোটগল্প ও কবিতার মূল উপাদানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাদটিকায় তুলিয়া দিতেছি।"[৩৮]

৩৮ ছিন্নপত্র (শ্রাবণ ১৩৬১)
(ক) পোষ্টমাষ্টার, পত্র-সংখ্যা ২১, ৫৯, ১১৯
(খ) ছুটি গল্পের উপাদান ২৮
(গ) বসুন্ধরা কবিতার ভাবটি, ৬৪, ৬৭
(ঘ) সোনার তরীর আকাশ, ৮৮
(ঙ) গ্রাম্য সাহিত্য প্রবন্ধ, ৯৩
(চ) মেঘ ও রৌদ্র, ১০৬
(ছ) পদ্মা (চৈতালি), ৮৪, ১৩৮
(জ) নিশীথে গল্পের বর্ণনা, ১০
(ঝ) পণরক্ষা গল্পের বর্ণনা
(ঞ) অক্ষমা, দরিদ্রা (সোনার তরী), ১৮
(ট) সঙ্গী (চৈতালি), ২০
(ঠ) গানভঙ্গ (কাহিনী), ৬০
(ড) ইছামতী (চৈতালি), ৮৯, ১৪৬
(ঢ) শৈশবসন্ধ্যা (সোনার তরী), ১০৮
(ণ) অন্তর্যামী (চিত্রা), ১২৪
(ত) পুঁটু (চৈতালি), ১৩৭
(থ) কর্ম (চৈতালি), ১৪৮
(দ) পূর্ণিমা (চিত্রা) ১৫২
(ধ) মধ্যাহ্ন (চৈতালি), ২৭
(ন) ক্ষুধিত পাষাণের উপাদান ১১৯

চার

এতক্ষণ এই ভূখণ্ডের মানবিক সত্যের ও প্রাকৃতিক সত্যের কিছু বিবরণ দিলাম এবং সে বিবরণ যথাসাধ্য কবির ভাষাতেই দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন এই দুই প্রকার সত্যকে মিলাইয়া লইলে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার রহস্যের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিব। এই সঙ্গে যদি মনে রাখি যে, স্বল্পায়ত রচনাতেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, এবং আরও যদি মনে রাখি যে, মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ প্রকাশেই কবির শ্রেষ্ঠ আত্মরতি, সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বা সামাজিক তত্ত্ব প্রকাশকে তিনি গৌণ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে ছোটগল্প রচনার রহস্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

কেবল মানবিক সত্যের উপাদানে গল্পগুলি রচিত হইলে ইহাদের স্বাদ সরলতর হইত, হয়তো বা অধিকতর জনপ্রিয়ও হইত। কিন্তু কবি সে সহজ পথ গ্রহণ করেন নাই; মানবিক সত্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক সত্যের মিশল দিয়া গল্পগুলিকে কবিত্বরসে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যুগপৎ কবি ও কাহিনীকারের জোড়কলমে রচিত—ইহা এগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কবি নিজেই তাঁহার ছোটগল্প রচনার এই রহস্যময় কৌশলের বর্ণনা করিয়াছেন—আবার তাঁহার কথাতেই তাহা শোনা যাক্।

"বসে বসে 'সাধনা' জন্যে একটা গল্প লিখছি—খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি, তারই চারিদিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শর-বন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা

শস্যই পায়, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ, বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা সমস্তই বাদ পড়ে যায়। আমার গল্পের সঙ্গে যদি মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধরৌদ্ররঞ্জিত ছোট নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম, তাহ'লে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে এক মুহূর্তে বুঝে নিতে পারত। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে, তা-ও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।"[৩৯]

এমন স্পষ্টভাবে, সুন্দরভাবে স্বয়ং লেখক যেখানে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, সেখানে সমালোচকের আর কি কাজ থাকিতে পারে। (কবির কথা আরও খানিকটা সে উদ্ধার করিয়া দিতে পারে মাত্র।)

"বাইরের জগতের একটা সজীব প্রভাব ঘরে অবাধে প্রবেশ করে, আলোতে, আকাশে, বাতাসে, শব্দে, গন্ধে, সবুজ হিল্লোলে, এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে কত গল্পের ছাঁচ তৈরি হয়ে ওঠে। বিশেষত এখানকার দুপুরবেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। ···মনে আছে, ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্টমাস্টার গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চার দিকের আলো, বাতাস, ও তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এই রকম চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ, তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে।"[৪০])

(এবারে মেঘ ও রৌদ্র নামে বিখ্যাত গল্পটির সৃষ্টিক্ষণের ইতিহাস) শোনা যাক। (ইহার অভিজ্ঞতাও পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতার অনুরূপ।

"গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিন-রাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার

৩৯ ২৮ জুন, ১৮৯৫, সাজাদপুর, ছিন্নপত্র।

৪০ ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, সাহজাদপুর, ছিন্নপত্র।

একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সঙ্কীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময়ে পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবে মাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে—হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল; তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল।"[৪১]

নৈসর্গিক জগতের মতো রবীন্দ্রনাথের জগৎও পঞ্চভূতের উপাদানে সৃষ্ট। তাহাতে অবশ্যই ক্ষিতি ও অপ্ আছে, আর স্বভাবতই সেগুলা বেশি স্পষ্ট, কিন্তু তেজ মরুৎ ও ব্যোমও বর্তমান। সেগুলা তেমন-ভাবে চোখে পড়িতে চায় না, কিন্তু তাহাদের বাদ দিয়া বিচারে বসিলে বিচার অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য।

৩০শে আষাঢ়, ১৮৯৩ সালে সাজাদপুর হইতে লিখিত একখানি চিঁঠিতে কবি নিজের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, কবিতা রচনাতেই তিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান, কিন্তু ছোটগল্পও মন্দ লিখিতে পারেন না, আবার কতক ভাবকে ডায়ারি আকারেই লিখিতে ইচ্ছা যায়। সেই সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন যে, চিত্রকলার প্রতিও একটা গোপন অনুরাগ পোষণ করেন। মোট কথা, 'মিউজ'দের মধ্যে কোনোটিকেই তিনি হাতছাড়া করিতে রাজী নহেন।

তাঁহার কবিতা ও ছোটগল্পের মধ্যে যে ভেদ তিনি করিয়াছেন, সে ভেদ বস্তুত আছে কি না সন্দেহ, অন্তত যে পর্বের কথা বলিতেছি,

৪১ ২৭ জুন, ১৮৯৪, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র।

সে পর্বে না থাকিবার মতোই। ছোটগল্পগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে নামিলে দেখিতে পাইব যে, একই বস্তু বা ভাব কখনো গল্পাকারে কখনো কাব্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, আবার কখনো বা কতকটা কবিতায় কতকটা গল্পে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার এই পর্বের অধিকাংশ কবিতা ও গল্প পরস্পরের পরিপূরক, এখানেই তাহাদের বৈশিষ্ট। সেটুকু বুঝিবার জন্য তাঁহার গল্প রচনার কৌশল বোঝা দরকার—সেইজন্য কিছু বিস্তারিতভাবেই তাহার আলোচনা করা গেল। এবারে ছোটগল্পগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় নামা যাইতে পারে।

পাঁচ

গল্পগুলির বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্বে একটি কথা আর একবার মনে করাইয়া দিই। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁহার সাহিত্যে পাশাপাশি দুটি ধারা বর্তমান, একটি সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানবসংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, আর একটি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-লোকে উধাও হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার সমকালীন কবিতা ও গল্প মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে যে, কবিতায় ঐ নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর, আবার গল্পে সুখদুঃখবিহর-মিলনপূর্ণ মানবসংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর। এই মূল সূত্রটি মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।[৪২]

---

৪২ রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, গানে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর; আবার ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে তুলনায় উপন্যাসে সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ সংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর। এ বিষয়ে তাঁহার ছোটগল্পের স্থান কবিতা ও উপন্যাসের মাঝামাঝি।

ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা ছাড়িয়া দিলে গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ডের প্রথম ছয়টি গল্প হিতবাদী পত্রিকার জন্য লিখিত। ছয় সপ্তাহ পরে কবি হিতবাদীতে লেখা বন্ধ করিয়া দেন, কারণ সম্পাদকগণ আরও হাল্কা জিনিস দাবি করিলেন। এই গল্পগুলির মধ্যে পোস্টমাস্টার গল্পটি বাদে কোনটিকেই উচ্চাঙ্গের রচনা বলা যায় না। অপরের দাবির সঙ্গে তাল রক্ষা করিতে গিয়া এই কাণ্ডটি ঘটিয়াছে, তবু সে দাবিকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইল না, লেখা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। নিছক সম্পাদকীয় তাগিদে রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় লিখিতে হইয়াছে, কিন্তু সে সব রচনা প্রায়ই উচ্চাঙ্গের শিল্প হয় নাই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমন একটি রচনা নৌকাডুবি। পোস্ট-মাস্টার ছাড়া অন্য সব গল্পগুলিতেই সংসারের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ আঁকিবার চেষ্টা আছে, কবির কলম সঙ্কুচিত। পোস্টমাস্টার কবির কলমে লিখিত। কলিকাতাবাসী পোস্টমাস্টারের আত্মীয়সঙ্গহীন প্রবাস-বেদনার অন্তরালে খুব সম্ভব কলিকাতাবাসী কবির প্রবাস-যাপনের দুঃখও লুক্কায়িত ছিল—স্থান-কাল-পাত্রের বড় বেশি মিল, কাজেই কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মতো।

এবারে সাধনা পত্রিকা প্রকাশিত হইল; এ কবির নিজের কাগজ, অপরের অভিরুচিমতো লিখিবার বিড়ম্বনা না থাকায় কবি কল্পনার বল্‌গা ছাড়িয়া দিয়া চলিবার সুযোগ পাইলেন। সাধনার প্রথম গল্প খোকনবাবুর প্রত্যাবর্তন। এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পসমূহের অন্যতম। কি পরিকল্পনার দুঃসাহসিকতায়, কি স্বল্পাক্ষরে চরিত্রচিত্রণে, কি দুরূহ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সপ্ততাল ভেদে ইহার তুলনা হয় না। আর পদ্মা নদীর সজীব দুর্দম চিত্র এই গল্পটিতেই প্রথম পাইলাম।[৪৩]

৪৩ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে শ্যাম নামে যে বালকভৃত্যটির বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে বালক রাইচরণের মিল লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আর অগ্রসর হইবার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া লই। রবীন্দ্রনাথ কাছাকাছি সময়ে যে কবিতা ও গল্প লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম মিল আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সেই মিলের সন্ধান, ও সম্ভব হইলে তাহার রহস্যোদ্ঘাটন, এই প্রবন্ধের একটি প্রধান লক্ষ্য। তবে সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, গল্প ও কবিতা ভিন্ন শ্রেণীর শিল্প বলিয়া অন্তঃস্থিত মিল অনেক সময়ে প্রকট নয়; গল্পে যাহা ঘটনাপ্রবাহ, কবিতায় তাহাই হয়তো ভাবনায় প্রবাহিত; গল্পে যাহা বাস্তব, কবিতায় তাহাই হয়তো ভাবমাত্র। আবার অনেক সময়ে দেখা যাইবে যে, গল্পে যাহা সমর্থিত, কবিতায় হয়তো তাহার প্রতিবাদ। ইহাও এক প্রকার মিল, কারণ ঐ সমর্থন ও প্রতিবাদ পাশাপাশি মিলাইয়া লইলে কবির মনঃপ্রকৃতির সমগ্র রূপটি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আবার এ কথাও সত্য যে, এইরূপ মিল সন্ধানের নেশা একবার মাথায় চাপিয়া বসিলে হতভাগ্য সমালোচককে হাস্যকরতার পঙ্কে নিক্ষেপ করিতে পারে। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে নেশা প্রকাণ্ড একটা শক্তি, কিন্তু সমালোচকের পক্ষে অত বড় বালাই আর নাই।

সোনার তরী পর্বে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে একটা আষাঢ়ে গল্প, অসম্ভব কথা ও একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প রূপকথার ছাঁদে লিখিত। সোনার তরী কাব্যের অনেকগুলি কবিতাও তাই।[৪৪]

এই দুই শ্রেণীর রচনার মধ্যে সেতুস্বরূপ কবির নিজের শৈশবস্মৃতি। নিজের শৈশবকে, শৈশবের রূপকথার মধুর স্মৃতিকে পুনরায় সচেতন প্রয়াসে সৃষ্টি করিয়া উপভোগ করিবার ইচ্ছাতেই গল্প ও কবিতাগুলির সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়।* "তারপরে আমি ভাবলুম এই তো কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে এবং বর্তমানকে দূরকালের সঙ্গে

৪৪ বিম্ববতী, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, নিদ্রিতা, সুপ্তোত্থিতা।

* শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ম খণ্ড, পৃ ২৯, ২২৮

মিলিয়ে দিয়ে নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি।" কবির উক্তি তাঁহার গল্প ও কবিতা উভয়ত্র প্রযোজ্য। এই সঙ্গে গিন্নি গল্পটিও পড়া যাইতে পারে কারণ ঐ গল্পের ভিত্তি কবির বাল্যজীবনের একটি তিক্ত স্মৃতি।[৪৫]

দালিয়া একটি রোমান্টিক কাহিনী। এখনকার দিনে কোন রচনাকে অধঃপাতে দিতে হইলে ঐ রোমান্টিক শব্দটাই যথেষ্ট। তার উপরে কাহিনীটির মধ্যে একটা রাজা আছে, কাজেই রোমান্স ও রাজার দ্বৈত সংসর্গ দোষে কাহিনীটির অপাঙ্‌ক্তেয় হইবার জো হইয়াছে। এই গল্পে বর্ণিত ঘটনা নাকি সচরাচর ঘটে না, কাজেই কাহিনীটি রোমান্টিক। কিন্তু ইহা কি কোন কাহিনীর পক্ষে অপবাদ? ঘটনাকে আমরা ঘটনাস্রোত বলি অর্থাৎ তাহা কোন স্থানে স্থির হইয়া নাই। বর্তমান তথ্যের অবিকল নকল করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা সম্ভব নয়, কোন না কোন রন্ধ্রে তথ্যাতীত বন্যার জল ঢুকিয়া পড়িবেই। আর তা ছাড়া আজকার তথ্য আগামী কল্য কি রোমান্টিক বলিয়া মনে হইবে না? শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের সাবিত্রীর মেস নিশ্চয় একসময়ে অত্যন্ত রূঢ় বাস্তব ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই কি সাবিত্রী ও তাহার মেস কল্পনার বস্তুতে পরিণত হয় নাই?

"আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।"

ইহাই জীবনের ধর্ম। হাতের কাছে যাহা বাস্তব, দূরে গিয়া পড়িতেই

৪৫ ২৭শে জুন, ১৮৯৪, শিলাইদা, ছিন্নপত্র। শৈশবসন্ধ্যা কবিতাটিও এই ভাবের অনুষঙ্গরূপে পাঠ্য। একটি ক্ষুদ্র পুরাতন কথা (ভাদ্র, ১৩০০) গল্পটির সঙ্গে সোনার তরীর কণ্টকের কথা (কার্তিক, ১৩০০) কবিতাটি মিলাইয়া পড়িলে কবির লেখকজীবনের একটি নিঃশব্দ বেদনার পরিচয় পাওয়া যাইবে। একটা আষাঢ়ে গল্প পরবর্তী কালে তাসের দেশ নাটিকায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

তাহা দিব্যবস্তু। রূঢ় পাহাড় দূরে গিয়া পড়িবামাত্র মনোরম বলিয়া প্রতিভাত হয়।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, তথ্য ও রোমান্স আপেক্ষিক সত্য, একই বস্তুর বা ভাবের অবস্থান্তর মাত্র। এমন বস্তুকে সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি করা চলে না। লেখকের উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্যের সার্থকতা দ্বারা বিচার করা আবশ্যক।

দালিয়া গল্পে অনেকগুলি রাজা ও শাহাজাদী আছে সত্য। কিন্তু রাজকীয়তা প্রকাশই কি লেখকের উদ্দেশ্য ? ছদ্মবেশী রাজা ও রাজ-কন্যাদের অন্তরে যে অত্যন্ত সার্বজনীন মানবধর্ম নিহিত ছিল, তাহারই উন্মোচন কি কবির লক্ষ্য নয় ? এই মানবধর্মের ক্ষেত্রে আরাকানের বুড়া ধীবর, আরাকানের রাজা এবং শা-স্তুজার কন্যাগণ সমান। পোশাকে ও সামাজিক মর্যাদায় দুস্তর ভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ যে এক, ইহার চেয়ে অটল রিয়ালিজম আর কি হইতে পারে ? এই রিয়ালিটির উপরেই তো শিল্প ও সাহিত্যের ভিত্তি। সাহিত্যবিচারে ইহাই তো মাপকাঠি হওয়া উচিত। নিয়তির মধুর পরিহাসে—নিষ্ঠুর বিদ্রূপও হইতে পারিত—ছদ্মবেশী পাত্রপাত্রীগণের সার্বজনীন মানবধর্ম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। গল্পটির রোমান্টিক অপবাদ খণ্ডনের আশায় এতগুলি কথা বলিলাম বলিয়াই কেহ না মনে করেন যে, এটিকে রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প মনে করি। কাহিনীর মধ্যে যেসব সম্ভাবনা ছিল, সেগুলির পুরাপুরি সদ্ব্যবহার করা হয় নাই, ফলে গল্পটির উপসংহার অকালে আসিয়া পড়িয়াছে, মনে হয় মাঝ-খানের অনেকগুলি পাতা যেন হারাইয়া গিয়াছে, কিংবা মাঝখানের অনেকটা পদ লোপ পাইয়াছে। এ রকম মধ্যপদলোপী গল্প রবীন্দ্র-সাহিত্যে আরও পাওয়া যাইবে। কাহিনীর রোমান্টিকতা ইহার শ্রেষ্ঠত্বের অন্তরায় নয়; রোমান্টিক হইতে গিয়া কবি যথেষ্ট রোমান্টিক হইতে পারেন নাই, ইহাতেই গল্পটির রস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

কঙ্কাল গল্পটি সোনার তরী কাব্যের শৈশবসন্ধ্যা কবিতাটির

সমমাসে লিখিত, শৈশবসন্ধ্যার স্মৃতি দুটি রচনাতেই বিদ্যমান, 'এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন।' কিন্তু গল্পটির রসস্বরূপ ভিন্ন, তাহার সঙ্গে লেখকের শৈশবের সম্বন্ধ বড় নাই। মুখ্যত এটি ভৌতিক গল্প হইলেও, মৃত্যুর রহস্য ইহার বর্ণনীয় বিষয় হইলেও, এমন মানবিক কাহিনী, এমন জীবনরহস্যপূর্ণ কাহিনী অত্যন্ত বিরল। জীবনের জয়ধ্বনি তুলিবার জন্যই কবি যেন ভৌতিক কণ্ঠকে আহ্বান করিয়াছেন। জীবনের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বড় বিচিত্র, অনেকটা প্রৌঢ়া স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্বন্ধের মতো। তাহার সঙ্গে নিত্য খিটিমিটি বাধিতেছে, কিন্তু তাহার কাছে ফিরিয়া না আসিলেও স্বস্তি নাই। ঐ যে সৌন্দর্যদলফুল্ল মেয়েটি ক্রুদ্ধ অভিমানে একদিন মৃত্যুবরণ করিয়াছিল, তাহারই প্রেতাত্মা আজ স্বর্ণময় স্মৃতির পিঞ্জরের চারিদিকে মুগ্ধ বিহঙ্গের মতো পাখা ঝাপটাইয়া করুণ আর্তনাদ করিয়া মরিতেছে। মৃত্যুর প্রতি নয়, জীবনের প্রতি সুগভীর আসক্তিই গল্পটির রসস্বরূপ। এই ভাবটি রবীন্দ্রকাব্যের একটি মূল ভাব। এই অশরীরী প্রেতাত্মা অনায়াসে বলিতে পারিত, আচরণের দ্বারা অবশ্যই বলিয়াছে, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।[৪৬]

ত্যাগ গল্পটির নায়ক হেমন্ত পত্নী কুসুমকে ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়া পুরুষোচিত কার্যই করিয়াছে। কিন্তু হেমন্তের মত গঠনে কুসুমের কোন কৃতিত্ব নাই, সে 'ভূমিতলে দুই হাতে তাহার (হেমন্তের) পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া' ছিল। কিন্তু বলাকা

৪৬ মুক্তির উপায় গল্পটিতে তামসিক সন্ন্যাসকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। এরূপ আরও দুইটি উদাহরণ পাওয়া যাইবে, উদ্ধার ও তপস্বিনী গল্প। উদ্ধার গল্পটির সন্ন্যাসীর অধঃপতন চিত্রিত হইয়াছে, তাহার অন্তরে অবশ্যই তামসিকতা লুক্কায়িত ছিল, নারীর রূপাগ্নির শিখা তাহাকে বিবরের বাহিরে আনিয়াছে। পরবর্তী কালে মুক্তির উপায় কবিকর্তৃক নাট্যীকৃত হইয়াছে।

ও পলাতকা পর্বে এই গল্পটি লিখিলে কবি কুসুমকে অন্য ধাতুতে গড়িতেন, হতভাগ্যের মতো সে পায়ের উপরে পড়িয়া থাকিত না, খুব সম্ভব সে-ই স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইত।

একরাত্রি একটি অপূর্ব সৃষ্টি, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি সুগীত সঙ্গীতের মতো ধ্বনিত হইয়াছে। গল্পটির সঙ্গে সমকালে লিখিত দুটি কবিতার মিল দেখিতেছি।[৪৭] গল্পের নায়ক সুরবালাকে একদিন ইচ্ছা করিলেই পাইত, কিন্তু না, সে গারিবল্‌ডি হইবে, কাজেই সুরবালাকে বিবাহ করিল না। তারপরে যখন অনুশোচনার দিন আসিল, তখন দেখিতে পাইল সুরবালার স্মৃতিটি কী মনোহর! আর হতভাগ্য সে কিনা আকাশের চাঁদ চাহিয়াছিল। আকাশের চাঁদ আকাশেই থাকিল, মাঝ হইতে একদা যাহা অনায়াসপ্রাপ্য ছিল, দুষ্প্রাপ্য হইবামাত্র তাহা অপূর্ব মনোরমত্ব লাভ করিল! তাহার দুই কূলই গেল।

'মনের ভিতর কে বলিল, তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে, এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না।'

তখন সে

"দেখে বহুদূরে ছায়াপুরীসম
অতীত জীবনরেখা
অস্তরবির সোনার কিরণে
নূতন বরণে লেখা।"

তখন সে

"দু বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায়
ঐ জীবনের মাঝে।"

---

৪৭ একরাত্রি (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯); পরশপাথর (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯), আকাশের চাঁদ (আষাঢ়, ১২৯৯)।

তখন সে

"যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায়
তার কিছু বেশি নহে।"

তখন

"সোনার জীবন রহিল পড়িয়া
কোথা সে চলিল ভেসে,
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি
রবিশশিহীন দেশে।"

আবার পরশ-পাথর কবিতাটির সঙ্গেও গল্পটির যেন মর্মগত মিল। পরশ-পাথরের সন্ন্যাসীর মতো গল্পের নায়কও

"অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুঁজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।"

নায়কের পক্ষে সুরবালাই পরশ-পাথর। সেই নারীর স্পর্শে তাহার স্মৃতির মাদুলি সোনা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখন কি সে বুঝিয়াছিল। আজ বহুদিন পরে যখন পরশ-পাথর সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের অতীত, তখন সে মাদুলির রূপান্তর দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছে। ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসীর পুনরায় সন্ধানের সান্ত্বনাটুকু আছে, গল্পের নায়কের বুঝি তাহাও নাই। "ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবল্‌ডিও হই নাই, এক ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল, আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।" ঐ রাত্রিটিই তাহার পক্ষে স্বর্ণ-মাদুলি, ঐ রাত্রিটির স্মৃতির দিকে তাকাইয়াই তাহাকে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, অনুসন্ধানের সৌভাগ্য হইতেও সে বঞ্চিত, সে এমনি হতভাগ্য!

স্বর্ণমৃগ এবং গুপ্তধন প্রায় একই ধাতুতে রচিত, যদিচ পরবর্তী গল্পটি শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অনেক বেশি সার্থক। স্বর্ণমৃগ একদিন রাম ও সীতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল, আজ আবার বৈদ্যনাথ ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইল। গুপ্তধন গল্পেও স্বর্ণমৃগের সেই একই লীলা, মৃতুঞ্জয়কে স্ত্রীপুত্রসংসার-ছাড়া করিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছে। সংসারের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা সন্ধান করিতে হইবে, স্বর্ণের লোভেই হোক আর সন্ন্যাসের লোভেই হোক অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিলে বিড়ম্বিত হইবার আশঙ্কাই সমধিক—এই যেন কবি বলিতে চান। স্বর্ণকারাগারে অবরুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় চিন্তা করিতেছে - "পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ, যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতি-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।"

পৃথিবী যে এত সুন্দর, আগে কি মৃত্যুঞ্জয়ের চোখে তাহা পড়িয়াছিল, অবজ্ঞার স্রোতে দূরে আসিয়া পড়িয়া তবে তাহা প্রকট হইল। অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস। এখানেও সেই আকাশের চাঁদ ও পরশ-পাথরের ভাবটি রূপান্তরে উপস্থিত।

এবারে জয়-পরাজয়ের গল্পটির সঙ্গে মানসসুন্দরীর কবিতার তুলনা করিতে চাই। মানসসুন্দরীর মতো কবিতায় রবীন্দ্রপ্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ, জয়-পরাজয় সম্বন্ধে সে দাবি করা যায় না সত্য, কিন্তু এখানে শিল্প-সার্থকতার বিচার হইতেছে না, হইতেছে ভাবগত ঐক্যের। এ দুটির রচনাকাল লক্ষ্য করিতে বলি, কাছাকাছি সময়।[৪৮] শিল্পস্রষ্টার মনের রহস্য যদি কিছু বুঝিয়া থাকি তবে তাহা এই; যতক্ষণ একটি

৪৮ জয়-পরাজয় (কার্তিক, ১২৯৯); মানসসুন্দরী (পৌষ, ১২৯৯)।

ভাব পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিতেছে, ততক্ষণ তাহা শিল্পী বা কবি কর্তৃক বারংবার প্রকাশিত হইতে থাকে ; সেই অসম্পূর্ণ প্রকাশ সৃষ্টির খসড়ামাত্র ; তারপরে ভাবটি যখন চূড়ান্তরূপে আত্ম-প্রকাশ করে, ভাবটির আত্মপ্রকাশ-চেষ্টায় নিবৃত্তি ঘটে। জয়-পরাজয় ও মানসসুন্দরীর মধ্যেও সম্বন্ধটা অনেকটা এই রকম। জয়-পরাজয়ে যাহার আংশিক ও অসম্পূর্ণ প্রকাশ, মানসসুন্দরীতে তাহারই চরম ও চূড়ান্ত সফলতা।

মানসসুন্দরী কবির মানসী, সে মানবীমাত্র নয়, সে 'কবিতা কল্পনালতা'। শেখর কবিরও একজন মানসসুন্দরী আছে, সে অদৃশ্য, অনায়ত্ত, কিন্তু তাই বলিয়াই কিছুমাত্র কম বাস্তব নয়। নক্ষত্রলোকের পানে যেমন ধূপসৌরভ ওঠে, শেখর কবির সমস্ত কবিতাই তেমনি-ভাবে, তেমনি হতাশ আগ্রহে সেই রহস্যময়ীর পদপ্রান্তের দিকে উত্থিত হইয়াছে। কবির কাছে রাজা, রাজসভা, কাব্যদ্বন্দ্ব, কবি-প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্তই অলীক ; সত্য সেই অদৃষ্ট রহস্যময়ী, জীবন ও জীবনান্ত যাহার পায়ে নিঃশেষে নিবেদিত হইয়াছে। শেখর কবি সারাজীবনের কাব্যসঞ্চয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার সময় বলিতেছে—"তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, হে সুন্দরী অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিলে, হে মোহিনী বহ্নিরূপিণী, যদি সোনা হইতাম তো জ্বলিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম, কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবী, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।" মানসসুন্দরীর কবিও কবিতা কল্পনালতার উদ্দেশে এই ভাবের কথা বলিতে পারিত। আমার তো মনে হয়, দুই মাসের ব্যবধানে লিখিত রচনা দুইটিতে মূল ভাগবত প্রেরণা অভিন্ন ; তফাতের মধ্যে এই যে, কাব্যে যাহা বিশ্বের কবিতা-রূপ, গল্পটিতে তাহাই গৃহের বনিতা-মূর্তি ; আর যেটুকু প্রভেদ, তাহা কবিতা ও গল্পের অর্থাৎ ভিন্ন শিল্পের দাবিগত প্রভেদ।

কাবুলিওয়ালা গল্পটির সঙ্গে যেতে নাহি দিব কবিতাটির মর্মগত মিল অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট।[৪৯] দুটি রচনাতেই শিশুকন্যার প্রভাবে অভ্যাসের জড়তা হইতে পিতৃমন মুক্তি পাইয়াছে। 'যেতে নাহি দিব'র শিশুকন্যার বেদনা বিশ্ব-বেদনায় পরিণত হইয়াছে, আর মিনি ও তাহার অদৃশ্য পরিপূরক রহমতের কন্যা দু'য়ে এক হইয়া বেদনার বিদ্যুৎ-ঝলকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে যে, কলিকাতার শিক্ষিত নাগরিক ও অশিক্ষিত খুনে কাবুলিওয়ালার মধ্যে ভেদ যতই দুস্তর হোক, তবু এক পিতৃত্ববোধের মধ্যে উভয়ের সঙ্গতি হইয়াছে। বিষয়টি লইয়া পরে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে, কাজেই এখানে এইটুকুই যথেষ্ট।

ছুটি গল্পটি পোস্টমাস্টার গল্পের উল্টোপিঠ। শহরবাসী পোস্ট-মাস্টার আত্মীয়স্বজনহীন পল্লীপ্রবাসে আসিয়া পড়িয়াছে, আর ফটিক পল্লীগ্রামের ছেলে, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন হইয়া শহরে গিয়া পড়িয়াছে। দুটি অবস্থাই বেদনাজনক হইতে পারে, তেমন ক্ষেত্রে বেদনার রূপ আলাদা, স্বরূপ এক। একই বেদনাকে ভিন্ন ক্ষেত্র হইতে দেখিবার ইচ্ছায় পোস্টমাস্টার গল্পটি লিখিবার বছরখানেক পরে ছুটি গল্পটি লিখিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। প্রথম গল্পটি লিখিবার সময়ে কবি শহরবাসীর পল্লীপ্রবাসের দুঃখই কেবল জানিতেন, কিন্তু এতদিনে পল্লীজীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইবার ফলে বিপরীত দুঃখটার প্রকৃতিও বুঝি জানিতে পারিয়াছেন।[৫০]

সুভা গল্পটি ছুটি গল্পটির পরবর্তী মাসে লিখিত। পিঠোপিঠি গল্প দুটি যেন একই ভাবের এপিঠ-ওপিঠ। মূঢ় ফটিক পল্লীজননীর

---

৪৯ কাবুলিওয়ালা (অগ্রহায়ণ, ১২৯৯), যেতে নাহি দিব (কার্তিক, ১২৯৯)।

৫০ দ্রষ্টব্য পত্র, সাজাদপুর, ছিন্নপত্র, ২৮ (১৩৬৭ সং); ছুটি (পৌষ, ১২৯৯), সুভা (মাঘ, ১২৯৯)।

কোল ছাড়িয়া আসিয়া কেমন যেন অসহায় ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ঠিক তাহার মৃত্যুর কারণ না হইলেও তাহার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত ও নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছে। বোবা বালিকা সুভা পল্লীর গাছপালা পশুপাখীর সঙ্গে মিলিয়া এক রকম সুখেই ছিল, অন্তত দুঃখ কাহাকে বলে ঠিক জানিত না। এমন সময় বিবাহোপ-লক্ষ্যে শহরে আনীত হইয়া (ফটিক আনীত হইয়াছিল পাঠ উপলক্ষ্যে, দুই-ই সমান নিষ্ঠুর হইতে পারে) বোবা বালিকা সুভা এবারে সত্য সত্যই মূঢ় হইয়া পড়িল। ঐখানেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে—ইহার পরে কায়িক মৃত্যু ঘটানো বাহুল্য মাত্র। ফটিক ও সুভা কেহই শহরের আবহাওয়ায় টিকিল না। "দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ।" গল্প দুটিকে এইভাবে বিচার করিলে পরস্পরের সান্নিধ্যে গভীরতর অর্থগৌরব পাওয়া যাইতে পারে।

সমাপ্তি গল্পের নায়িকা কপালকুণ্ডলার সগোত্র এবং ফটিক ও সুভার সহোদরা। তাহার মৃন্ময়ী নাম সার্থক, মাটি ও প্রকৃতির সঙ্গে সে এমনি একাত্ম হইয়া আছে যে, অপূর্বর প্রণয়ের দিকে তাকাইবার সুযোগ পায় নাই। স্বামীর প্রেমকে উপলব্ধির জন্য বিচ্ছেদের গুরুতর আঘাতের প্রয়োজন তাহার ছিল, সেই আঘাতের ফলে তাহার যেন একটা চটকা ভাঙিয়া গিয়াছে, কেবল তখনই সে মাটির বাঁধন কাটাইয়া স্বামীর বাহুবন্ধনে ধরা দিতে পারিয়াছে। ফটিক, সুভা, মৃন্ময়ী তিনজনেই প্রকৃতির শিশু। এই গল্পগুলি পড়িলে বোঝা যায় যে, প্রকৃতির সুনিবিড় অন্ধ আকর্ষণ কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিমন নয়, তাঁহার কাহিনীস্রষ্টা মনও অনুভব করিতে শুরু করিয়াছে। কবির উপরে পল্লীপ্রকৃতি তাহার ক্ষুধিত পাষাণের প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। পোস্টমাস্টার লোকটা সত্যই চতুর ছিল, তাই এমন সর্বনাশা দেশ ছাড়িয়া পূর্বাহ্নেই সরিয়া পড়িয়াছিল। মাটির প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, পৃথিবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ বরাবর একটা অন্ধ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, এ গল্পগুলি তাহারই স্বাক্ষর। আরও

স্বাক্ষর আছে, উজ্জ্বলতর স্বাক্ষর—এক মাস পরে লিখিত বসুন্ধরা কবিতায়।[৫১]

এবারে আমরা গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ করিলাম; এখন বাংলা ১৩০১ বা ইংরেজী ১৮৯৪ সাল; কবির বয়স তেত্রিশ বছরের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তিনি এখন চিত্রার কবিতাগুলি লিখিতেছেন।

এখনকার গল্পগুলিতে কেবল আর অন্তর্জীবনের ছায়া নয়, নানা-প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ছায়া পড়িতেছে দেখিতে পাইব। সেইজন্য গল্পগুলিকে কেবল কবিতার সঙ্গে নয়, কবির অন্যান্য রচনার সঙ্গেও মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

অনধিকার প্রবেশ গল্প রচনার সঙ্গে তৎকালীন একটি ঘটনার যোগ আছে বলিয়া রবীন্দ্রজীবনী-প্রণেতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন। তিনি লিখিতেছেন—

"এই সময়ে (১৮৯৪) সুইডেন হইতে হামারগ্রেন নামে এক যুবক কলিকাতায় আসেন। রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া যুবকটি বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হন ও নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশের কোন সেবার কাজে জীবন উৎসর্গ করিবেন এই সঙ্কল্প অন্তরে বহন করিয়া এদেশে আসেন। নিরন্তর অনিয়মে পরিশ্রম করিয়া অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, হিন্দুর ন্যায় যেন তাঁহার দাহ-কার্য হয়।"…"রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটি লইয়া 'বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন (সাধনা, শ্রাবণ, ১৩০১)… এই মাসেই 'অনধিকার প্রবেশ' নামে গল্পটি লেখেন।"[৫২]

---

৫১ সমাপ্তি (আশ্বিন, ১৩০০), বসুন্ধরা (কার্তিক, ১৩০০)।

৫২ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড, পৃ ৩০৩-৩০৪।

মেঘ ও রৌদ্র গল্পটি ১৩০১ সালের আশ্বিন-কার্তিক মাসে লিখিত। এই সময়ে কবিকে মফস্বলে থাকিতে হইত বলিয়া ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচারের পরিচয় ঘনিষ্ঠভাবে পাইতেন। গল্পটির মধ্যে সেই সব অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ভাদ্রমাসে এইরূপ ঘটনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ তিনি লেখেন (অপমানের প্রতিকার, সাধনা, ভাদ্র ১৩০১)।[৫৩] শশিভূষণের জীবনস্রোত এক অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীর চক্রান্তে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। দেশের দুর্বলেরা যে কত দুর্বল, অসহায়েরা যে কত অসহায়, এবারে যেন কবি বুঝিতে পারিলেন। ইহার কয়েক মাস আগে লিখিত "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় এই অপমানের বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে।[৫৪]

অগ্রহায়ণ মাসে প্রায়শ্চিত্ত গল্পটি এবং পৌষমাসে বিচারক গল্পটি লিখিত হয়—আগের বছর সমস্যা-পূরণ ও শাস্তি গল্প দুটি লিখিত হইয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে লিখিত রাজটিকা (আশ্বিন, ১৩০৫) গল্পটিকে যদি গ্রহণ করি তবে দেখিতে পাইব যে, নানাবিধ সামাজিক সমস্যা কবির রচনায় ছায়াবিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে—গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ গল্প এই প্রভাব হইতে মুক্ত। "এবার ফিরাও মোরে" আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হইয়া কবি লোকজীবনের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন।

এবারে এমন কতকগুলি গল্প ও কবিতার সম্বন্ধ বিচার করিতে উদ্যত হইয়াছি যে, সে যোগাযোগ সম্বন্ধে আমি নিজেই খুব নিশ্চিত নই। এখানে প্রমাণের চেয়ে অনুমানের উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে, বুদ্ধি অগ্রসর হইতে চাহে না, কিন্তু বোধ হাল ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়। রসের বিচারের ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে বোধের দাবি, প্রমাণের চেয়ে অনুমানের মূল্য কম নয়।

---

৫৩ রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড, পৃ ৩০৫।

৫৪ এবার ফিরাও মোরে (ফাল্গুন, ১৩০০)।

এখানে মানভঞ্জন, প্রতিহিংসা ও উর্বশী কবিতা আমার আলোচ্য বিষয়।[৫৫]

(রবীন্দ্রনাথের উর্বশী পৌরাণিকী বা বিদেশিনী নয়; পুরাণের বর্ণনা বা সুইনবার্নের কবিতার মধ্যে তাহার রহস্য নিহিত নয়। সে-সব স্থান হইতে রহস্যোদ্ধার করিতে গেলে ভুল করিবার আশঙ্কাই সমধিক। প্রসিদ্ধ কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার উর্বশী কবিতার বিচারে কবির প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা। তাঁহার বক্তব্য এই যে, যে-উর্বশী নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ তাহার আবির্ভাবে "অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা" কেন হইবে? মানবসম্বন্ধাতীত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরূপিণী মানবমনে বাসনার ঢেউ জাগাইবে কেন? মোহিতলাল মনে করেন যে, এখানে এই দ্বৈত-প্রেরণার ফলে কবিতাটিতে রসাভাস ঘটিয়াছে। কবিতাটির মূল অন্যত্র সন্ধান না করিয়া রবীন্দ্রকাব্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে এরূপ অবিচার হইত না; কেননা, আগেই বলিয়াছি যে, উর্বশীর রহস্য রবীন্দ্রকাব্যেই সন্ধান করিতে হইবে। রবীন্দ্রকাব্যে পরবর্তীকালে যে "দুই নারী"-তত্ত্ব সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে, উর্বশীতে তাহারই প্রথম অচেতন প্রকাশ। নারীর এক মূর্তি প্রিয়া, এক মূর্তি জননী; এক মূর্তি উর্বশী, এক মূর্তি লক্ষ্মী। কবিব সচেতন প্রয়াস যাহাই হোক, উর্বশী কবিতাটি লিখিবার সময়ে তাঁহার অগোচরে এই দুই মূর্তির মিশল ঘটিয়া গিয়াছে; সে একাধারে মানবসম্বন্ধাতীত, আবার মানবসম্বন্ধের অন্তর্গতও বটে। মনে হয় যেন, রহস্যময়ী কবিপ্রতিভা কবির অগোচরে তাঁহার লেখনীকে অনভীষ্ট পথে চালনা করিয়া কবিতাটি সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক মনে করি না, কারণ কবির নারীতত্ত্ব এই পথেরই

৫৫ মানভঞ্জন (বৈশাখ, ১৩০২), প্রতিহিংসা (আষাঢ়, ১৩০২), উর্বশী (অগ্রহায়ণ, ১৩০২)।

সূচনা দিতেছে, এই তত্ত্বেই রবীন্দ্র-নারীতত্ত্বের পরিণতি। এখন এ কথাটি মনে রাখিলে কবিতাটি রসাভাসগ্রস্ত মনে না হইয়া পরিণামের আভাসগ্রস্ত বলিয়া মনে হইবে। চিত্রা কাব্যেই কয়েক মাস পরে লিখিত একটি কবিতায় এই তত্ত্বটি সচেতনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।[৫৬]

মানভঞ্জন গল্পের গিরিবালা এবং প্রতিহিংসা গল্পের ইন্দ্রাণী দুইজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসামান্য, রূপে এবং ব্যক্তিত্বে। তবে প্রভেদ এই যে, গিরিবালার মধ্যে নারীর প্রেয়সীমূর্তি অধিকতর প্রকট, আর ইন্দ্রাণীর মধ্যে জননীমূর্তি; একজন স্বামী কর্তৃক অবহেলিত, অপরজন স্বামীর পরম নির্ভর; আর দুইজনেই সমান রহস্যময়ী এবং অনেক পরিমাণে কেমন যেন সাংসারিকতা হইতে বিবিক্ত। এখন ইহাদের দুইজনকে একত্র মিশাইলে উর্বশীর একটা খসড়া পাওয়া যাইতে পারে। আমার মনে হয়, গিরিবালা ও ইন্দ্রাণীর মতো রহস্যময়ী নারী-চরিত্রের রক্তকমলের উপরে পদক্ষেপ করিয়াই কবি উর্বশীর চিরন্তনী ও সর্বময়ী নারীমূর্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ঠিক এরকম নারীচরিত্র ইতিপূর্বে আর তিনি সৃষ্টি করেন নাই।

ক্ষুদিত পাষাণ গল্প এবং স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতা পরস্পরসম্বন্ধ-যুক্ত বলিয়া মনে হয়।[৫৭]

স্বর্গ হইতে বিদায়ের কালে বিদায়ী মানুষটি বুঝিতে পারিয়াছে যে, পৃথিবীর তুলনায় স্বর্গ কত হৃদয়হীন ও অবাস্তব, স্বর্গের ইন্দ্রাণীর চেয়ে মর্তের দীন কুটীরের প্রেয়সী কত বাঞ্ছনীয়; কারণ স্বর্গ যতই রমণীয় হোক তাহার সঙ্গে মানব-হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়।

৫৬ রাত্রে ও প্রভাতে (ফাল্গুন, ১৩০২)।

৫৭ ক্ষুধিত পাষাণ (শ্রাবণ, ১৩০২), স্বর্গ হইতে বিদায় (অগ্রহায়ণ, ১৩০২)।

ঠিক এই রকম অবস্থা ও অবাস্তবতা ক্ষুধিত পাষাণের প্রাসাদের নয় কি? সেখানকার অবাস্তব রমণীয়তা তুলার মাশুলের হাকিমকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে কিন্তু কখনো আপন করিয়া লইবে না। এখানকার সুন্দরী ছায়াময়ীদের লাস্যময় ইঙ্গিতের চেয়ে ওই পাগল মেহের আলির রূঢ় সতর্কবাণী যে অনেক বেশি সত্য, কারণ সেটা সম্পূর্ণ বাস্তব। এই হৃদয়হীন পাষাণের গ্রাস হইতে উদ্ধারের জন্য, এই অবাস্তব স্বর্গ হইতে বিদায়ের জন্য মানবহৃদয়স্পর্শলোলুপ মানুষটি সংসারে ফিরিয়া যাইবার আশায় ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিয়াছে—

"আমার উদ্ধারের কি কোন পথ নাই?"

এ সমস্তই আমার অনুমান মাত্র। সেই অনুমান বলিতেছে যে, আর কিছু নয়, দুটি রচনার মূলেই একটি ভাব সক্রিয় ছিল, অবাস্তবতার মোহময় স্বপ্নময় অলীক সৌন্দর্যময় কবল হইতে কবির উদ্ধারের ইচ্ছা।[৫৮]

অতিথি গল্পের তারাপদ স্পষ্টত সোনার তরী কাব্যের দুই পাখী কবিতার বনের পাখী। মনের খেয়ালে কয়েকদিনের জন্য কাঁঠালিয়ার জমিদারবাবুর স্নেহময় পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু "স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকটে চলিয়া গিয়াছে।" খাঁচার পাখীর সঙ্গে তাহার বিবাদ নাই, কিন্তু মনে সর্বদা ভয়, 'কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।'

এবারে সাধনা পত্রিকা বন্ধ হইয়া গেল, কাজেই নিয়মিত গল্পের চাহিদা আর রহিল না। ভারতী পত্রিকার ভার গ্রহণ করিতে এখনো

৫৮ মেহের আলির 'সব ঝুট্‌ হ্যায়' সতর্কবাণীকে রূঢ় বাস্তবের ঘণ্টাধ্বনি বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

বছর দুই বিলম্ব, তখন আবার নিয়মিত গল্প জোগাইতে হইবে, মাঝখানে বছর দুইয়ের ফাঁক। গল্পের চাহিদা নাই অথচ মনে গল্প লিখিবার তাগিদ আছে, এতদিন নিয়মিত গল্প লিখিবার পরে কলমের গল্পরচনা-প্রবণতা বেশ প্রবল, কাজেই এই ফাঁকে কবি যে কবিতা-গুলি লিখিয়া ফেলিলেন তাহাদের অধিকাংশই কাহিনীময় কাব্য।[৫৯]

অতঃপর ১৩০৫ সালের বৈশাখ হইতে ভারতীর সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি আবার নিয়মিত ভারতীর জন্য গল্প লিখিতে শুরু করিলেন। এই বছরে মোট সাতটি গল্প লিখিলেন।

দুরাশা রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনা-ক্ষমতার একটি শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। কিন্তু অনেকেই গল্পটির গৌরব রোমান্টিক বলিয়া লঘু করিয়া দিতে চেষ্টা করেন। ইঁহারা বোধ করি মনে মনে রোমান্টিকের অনুবাদ করেন অবাস্তব। কিন্তু এই দুই কি এক? অবাস্তব হইতেছে সেই বস্তু যাহার মূলে জীবনের অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্ত অভিজ্ঞতা। রোমান্টিক অবাস্তব নয়, তাহা এক বিশেষ পারিপার্শ্বিকে পরিকল্পিত অভিজ্ঞতা মাত্র; সে অভিজ্ঞতার ফুল যত উচ্চেই ফুটুক না কেন, তাহার মূল রহিয়াছে লেখকের জীবনে ও লেখকের সময়ে। এক হিসাবে মেঘনাদবধ কাব্য, আনন্দমঠ উপন্যাস ও দুরাশা গল্প তিনটিই রোমান্টিক কল্পনার সৃষ্টি, কারণ, এগুলি ভিন্ন পারিপার্শ্বিকে, দূরকালে ও দূরবর্তী সমাজের পটে পরিকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীগুলি তো ছবি নয়, ছবির ফ্রেম। ছবির মর্ম বা মূল লেখকগণের হৃদয়ে ও লেখকগণের সমকালে বর্তমান। নূতন ইংরেজী শিক্ষার মাদকতা ব্যতীত মেঘনাদবধ কাব্য কবির মাথায় আসিত কি? নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের উষাকাল ব্যতীত আনন্দমঠ পরিকল্পিত হইতে পারিত কি? আর যে-কবির

৫৯ (ক) চৈতালি, চৈত্র, ১৩০২, শ্রাবণ, ১৩০৩; (খ) মালিনী, ১৩০৩; (গ) কাহিনী:—গান্ধারীর আবেদন, পতিতা, নরকবাস, সতী, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, ভাষা ও ছন্দ, ১৩০৪; (ঘ) কথা:—শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, মস্তক বিক্রয়, ১৩০৪; (ঙ) দেবতার গ্রাস, ১৩০৪

কাছে সমাজের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠতর, জড় অভ্যাসের চেয়ে ধর্ম মহত্তর, কেবল তাহারই কল্পনা, বদ্রাওনের নবাব-দুহিতার বেদনার স্বর্ণে এমন দিব্য মূর্তি গড়িতে পারিত। সাহিত্যরচনার ফ্রেম নানা অসম্ভব স্থান হইতে গ্রহণ করিতে হয়, তাই বলিয়া ফ্রেমের মূল্যে ছবির মূল্য নিরূপণ করা উচিত হইবে না। বস্তুত ক্রমেই আমার এই বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, যাহাকে আমরা রোমান্স ও রিয়ালিজম বলি তাহাদের মধ্যে ভেদ ততটা বস্তুগত নয় যতটা দৃষ্টিগত।

দুরাশা গল্পটি ইতিমধ্যে-লিখিত কাহিনীনাট্যের মর্মগত বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত। মালিনী, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস প্রভৃতি নাট্যকাব্যের মূলগত ভাব ধর্মজিজ্ঞাসা। ধর্ম কি—এই প্রশ্নটি ঐ সব নাটকের পাত্রপাত্রীগণকে উদ্বেজিত করিয়াছে। ধর্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের মধ্যে যে একটি দ্বন্দ্ব বর্তমান তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে কবি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছেন। এখানেও সেই দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বসমাধান প্রচেষ্টার দুঃসহ পরিণাম। বদ্রাওনের নবাবদুহিতা দুর্গম গিরিপথে চলিতে চলিতে অতলস্পর্শী খাদের প্রান্তে আসিয়া বলিয়া উঠিয়াছে—"যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস, তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত।" তারপরে জীবনব্যাপী ব্যর্থ ব্রত ধারণের কপালে করাঘাত করিয়া সে বলিয়া উঠিয়াছে, "হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর-এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।" এ জিজ্ঞাসা, এ নৈরাশ্য কেবল ঐ হতভাগিনীর মাত্র নয়, স্ব স্ব ক্ষেত্রে সকল মানুষেরই। এই জিজ্ঞাসা সর্বজনীন সর্বকালীন। এর চেয়ে মহত্তর অভিজ্ঞতা আর কি হইতে পারে। এত বড় বাস্তব সত্যকে যাঁহারা রোমান্টিক বলিয়া তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সাহসের প্রশংসা করিতে হয় বটে! এই গল্পকে যাঁহারা রোমান্টিক অবাস্তবতা মনে

করেন, বুঝিতে হইবে ছবির ফ্রেমখানাকেই তাঁহারা ছবি বলিয়া মনে করেন।

সুপ্রিয় (মালিনী) এবং অর্জুন (চিত্রাঙ্গদা) রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ব্রতভঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু নবাবদুহিতা দেশব্রতধারী কেশরলালের ব্রতভঙ্গ করিতে পারে নাই। কেশরলাল ও কচ সমান ব্রতনিষ্ঠ; দেবযানী ও নবাবদুহিতা সমান হতভাগ্য ; বোধকরি নবাবদুহিতার দুর্ভাগ্যই অধিক, কেন না দেবযানী কচকে অভিশাপ দিয়া মনের অভিমান লঘু করিতে সমর্থ হইয়াছে, নিজেকে অভিশপ্ত করা ছাড়া নবাবদুহিতার হাতে আর কোন অস্ত্র ছিল না। এই "মুসলমান ব্রাহ্মণী"কে কবি নিষ্ফলতার এক অতলস্পর্শ খাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

১৩০৬ সালে ছোটগল্প পাই না, তার বদলে পাই কথা ও কাহিনীর অনেকগুলি কবিতা।[৬০] অর্থাৎ গল্পের স্রোতটাই গদ্যের কূল ছাড়িয়া পদ্যের কূল ঘেঁষিয়া চলিয়াছে এইটুকুমাত্র প্রভেদ।

১৩০৭ সালে আটটি গল্প পাইতেছি। তন্মধ্যে ফেল ও শুভদৃষ্টির বিষয় এক ; একটির সুর উচ্চগ্রামে বাঁধা, অপরটির সুর নিম্নগ্রামে বাঁধা। শুভদৃষ্টি গল্পের নায়ক কান্তিচন্দ্র দৈবক্রমে বোবা মেয়ের সঙ্গে বিবাহিত না হইবার পরে "যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে তাঁহার কোন সুখ ছিল না", শুভদৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। আর ফেল গল্পের অন্যতম নায়ক নলিন নিজের অমনোনীত বালিকাকে অবশেষে অপরের ঘরে বধূরূপে যাইতে দেখিয়া ঈর্ষায় ও নৈরাশ্যে কপাল চাপড়াইয়া মরিয়াছে।

৬০ পূজারিনী, অভিসার, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী, অপমান বর, স্বামী-লাভ, স্পর্শমণি, বন্দী বীর, মানী, প্রার্থনাতীত দান, রাজবিচার, শেষ শিক্ষা, নকল গড়, হোরি খেলা, বিবাহ, বিচারক, পণরক্ষা, বিসর্জন (কাহিনী)।

দুটি গল্পেরই মর্ম ভিন্ন আকারে আকাশের চাঁদের অনুরূপ।

এখন ১৯০১ সাল, কবির বয়স চল্লিশ বৎসর, তাঁহার আয়ুষ্কালের ঠিক মধ্যরেখা। এবারে তাঁহার ছোটগল্প-রচনার ধারায় সত্যকার ছেদ পড়িয়াছে। ১৯০১ হইতে ১৯১২ সালের মধ্যে মাত্র আটটি গল্প পাইতেছি। ছোটগল্প রচনায় ছেদ পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু গল্পরচনায় ছেদ পড়ে নাই—কারণ এই কয়েক বছরের মধ্যে তিনখানি উপন্যাস পাইতেছি—চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা। আগে যেমন দেখিয়াছি মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারা ক্ষীণ হইয়া গিয়া কাহিনীমূলক কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে, এখানে তেমনি দেখিতেছি, ছোটগল্পের ধারা ক্ষীণ, তার বদলে উপন্যাসের ধারাটি প্রবল।

নষ্টনীড় রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প।[৬১] নষ্টনীড় যেন চোখের বালির খসড়া। চোখের বালি বহু শাখা-প্রশাখায় জটিল, নষ্টনীড় আদর্শ ছোটগল্পের ন্যায় শরবৎ ঋজুগতিসম্পন্ন। ছোটগল্পকে উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করা উচিত হইবে না। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, চোখের বালির উপসংহার অনেকের কাছে যেমন অতৃপ্তিকর ও অসন্তোষজনক মনে হয়, নষ্টনীড়ের উপসংহার সম্বন্ধে তেমন অভিযোগ শোনা যায় না। চোখের বালি মহৎ, কিন্তু নষ্টনীড় নিখুঁৎ।

১৩২১ সালে (ইং ১৯১৪) পাই সাতটি গল্প। এগুলি সবুজ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে (১৩২৩-এ) পাই দুটি গল্প। আর ১৩২৪ সালে একটি মাত্র গল্প পাইতেছি। এগুলিকে একত্র বিচার করিতে হইবে।[৬২]

প্রথমেই লক্ষ্য করিবার ব্যাপার এই যে, এগুলির বিষয়বস্তু নানাবিধ সামাজিক সমস্যা। প্রথমদিকে লিখিত পোস্টমাস্টার,

৬১ নষ্টনীড়, বৈশাখ—অগ্রহায়ণ ১৩০৮ (১৯০১)

৬২ হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পুত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা। তপস্বিনী, পয়লা নম্বর (চলিত ভাষায় লিখিত প্রথম গল্প)। পাত্র ও পাত্রী।

ক্ষুধিত পাষাণ, একরাত্রি বা জয়-পরাজয়ের মতো একটি গল্পও ইহাদের মধ্যে নাই। কবির বিষয় এখানে আত্মকেন্দ্রী নয়, অন্যকেন্দ্রী। ঠিক পূর্ববর্তী পর্বের গল্পগুলিও তা-ই, কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদটা বুঝিবার জন্য এই পর্বের কবিজীবন আলোচনার যোগ্য।

১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সালের মধ্যে কবির তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, বলাকা, ফাল্গুনী আর পলাতকা। এই সঙ্গে চতুরঙ্গের কথাও মনে রাখা যাইতে পারে।[৬৩] এই সব গ্রন্থে নানা বিচিত্র ভাবের কথা থাকিলেও দুটি বিষয় অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছে। সংক্ষেপে সে দুটির নামকরণ করা যাইতে পারে—যৌবনের আহ্বান এবং নারীর মূল্য। একদা যে-যৌবনকে তিনি 'চল্লিশের ঘাট' হইতে বিদায় দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ফাল্গুনীতে তাহাকেই নূতন রসে, নূতন রূপে নিরাসক্ত যৌবন রূপে লাভ করিলেন, বলাকাতে তাহাকেই একটি জীবনতত্ত্বরূপে আহ্বান করিলেন। আর চতুরঙ্গে ও পলাতকা কাব্যে অনন্যনির্ভর হইয়া নারীর পূর্ণমূল্য দান করিলেন।

উর্বশীতে নারীর এক রূপ দেখিয়াছি, যে 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ'; সে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর, কিন্তু সে সংসারের কেহ নয়। মানস-সুন্দরীতে নারীর আর-এক রূপে, সে-ও সংসারের কেহ নয়। মানস-সুন্দরী যদি হয় গৃহকোণের দীপ, উর্বশী আকাশের শশিকলা। রবীন্দ্র-নাথের নারীর ধারণা পরিণতি লাভ করিয়াছে 'দুই নারী'-তত্ত্বে, যেখানে নারী এক রূপে উর্বশী আর এক রূপে লক্ষ্মী, অর্থাৎ এক রূপে প্রেয়সী ও অন্য রূপে জননী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গল্পে নারীর মাতৃ-মূর্তিরই প্রকাশ উজ্জ্বলতর। অবশ্য চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানীর মতো চরিত্রে প্রেয়সী মূর্তিই অধিকতর দীপ্যমান, কিন্তু তাহাদের পৌরাণিক পরিবেশের দূরত্ব হেতু এই দীপ্তি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া বাস্তব সংসারে

৬৩ বলাকা ১৯১৬, ফাল্গুনী ১৯১৬, পলাতকা ১৯১৮, চতুরঙ্গ ১৯১৬ সালে। চতুরঙ্গ ১৩২১ সালে সবুজ পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাস্তবচারিণী বিনোদিনীর রূপে প্রেয়সীর শিখাটি উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কবি যেন তাহাতে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাই তাহাকে বাস্তবভাবে সংসার-ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিয়াছেন। নষ্টনীড়ের চারুলতার সম্বন্ধেও এ কথা অংশত প্রযোজ্য। সংসার হইতে সে অপসারিত হয় নাই বটে তবে প্রদীপে যে তৈল জোগাইয়া আসিতেছিল সেই অমল দূরে প্রস্থিত হইয়াছে।) মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে রাসমণি ও আনন্দময়ীর মাতৃমূর্তির স্নিগ্ধ গৃহদীপটিই বেশি করিয়া নজরে পড়ে।

এবারে, এই গল্পগুলিতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল, বাস্তবচারিণী নারীর প্রেয়সী মূর্তিই এবার দীপ্ততর হইয়া উঠিল। নারীর প্রেয়সী মূর্তির সন্ধানে কবিকে আর পুরাণের ভূগোলে প্রবেশ করিতে হয় নাই, ঘরের কোণেই তাহাদের আবিষ্কার করিয়াছেন। সমাজে বিনোদিনী ও দামিনীর সমাবস্থা, কিন্তু কিছুকাল আগে যে কবি সত্বর হস্তে বিনোদিনীকে অপসারিত করিয়াছিলেন তিনিই নিপুণ হস্তে দামিনীর দীপে কামনার সুরভি তৈল ঢালিয়া দিয়াছেন। দামিনী তবু আধা-সংসারী আধা-সন্ন্যাসী, কাজেই এ ক্ষেত্রে অধিকতর প্রাসঙ্গিক হইতেছে স্ত্রীর পত্রের মৃণাল চরিত্রটি ; এতদিন যে-দীপ নীরবে নিভৃতে গৃহপ্রাঙ্গণ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, এবারে তাহা সংসারের চতুষ্পথকে আলোকিত করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছে। এই গল্পগুলির নারী উর্বশীও নয়, মানসসুন্দরীও নয় ; মাতা, বধূ বা কন্যা রূপে মাত্র মূল্যলাভের জন্য সে আদৌ ব্যস্ত নয় ; নারীরূপেই তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা ইহাই তাহার ধারণা।[৬৪] এবারে এই দুটি সূত্র—যৌবনের আহ্বান ও নারীর মূল্য—মনে রাখিয়া আলোচ্য পর্বের গল্পগুলিকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

হালদার গোষ্ঠীর বনোয়ারীলাল মনে মনে যৌবনের আহ্বান

৬৪ এই প্রসঙ্গে বাঁশরী, দুই বোন ও মালঞ্চ আলোচ্য।

শুনিয়াছে। যৌবনের ধম অমিতব্যয়িতা। সে টাকার জন্য হাত বাড়াইয়া দেখিল, দুস্তর বাধা। তখন সে ভাবিতেছে,—"একদিন এই ধন-সম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিবে। কিন্তু যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙীন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা-আপনি ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিখরের তুষার-সংঘাতের মতো; তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের ঢেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।"

বনোয়ারীলালের যৌবনের সার্থকতা-পথের বাধা হইল বংশ-মর্যাদা নামে অদৃশ্য অথচ অতিশয় বাস্তব একটি পদার্থ। বংশমর্যাদার বিরুদ্ধে সে একাকী, তাহার বিপক্ষে সকলেই, এমন-কি তাহার স্ত্রী পর্যন্ত। পত্নী কিরণলেখার কাছে বনোয়ারীর মূল্য স্বামী হিসাবে ততটা নয়, যতটা বংশের সন্তান হিসাবে, বংশের ভিত্তি বাদ দিয়া স্বামীকে দেখিতে সে অভ্যস্ত নয়। অবশেষে গোষ্ঠীবিদ্রোহী বনোয়ারীলাল পরাজিত হইয়া একাকী "চাকুরি খুঁজিতে বাহির হইল।"

এখানে যৌবনের আহ্বানে স্পষ্টত বংশ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। সে দ্বন্দ্বে যদিচ ব্যক্তির পরাজয় হইয়াছে কিন্তু মনে রাখিবার বিষয় দ্বন্দ্বটা। কারণ ইহা কবির ছোটগল্পে একটি নূতন সূত্র।

ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, পণরক্ষা গল্পের বংশী বংশরক্ষা করিবার আশাতেই দিবারাত্রি খাটিয়া তিলে তিলে মরিয়াছে। রসিক যদিচ গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তাহার সে রাগ বনোয়ারীলালের মতো বংশের বিরুদ্ধে নয়, নিতান্তই দাদার বিরুদ্ধে। অবশেষে রসিক বংশের আকর্ষণ স্বীকার করিয়াই স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে।

রাসমণির ছেলে গল্পের প্রধান নায়ক কোন মানুষ নয়, শানিয়াড়ির

চৌধুরী-পরিবার নামে একটি গোষ্ঠীর সম্ভ্রম। ভবানীচরণ মোহসিঞ্চনে তাহাকে লালন করিয়াছে, এমন-কি রাসমণির মতো অসাধারণ নারীও তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, কালীপদ ঐ বংশগৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাতেই অকালে প্রাণবিসর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

গুপ্তধনের মৃত্যুঞ্জয়ের অর্থাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বনোয়ারীলালের অর্থা-কাঙ্ক্ষার কত প্রভেদ। বনোয়ারী টাকা চায় নিজের জন্য, ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য, আর মৃত্যুঞ্জয় চায় বংশমর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য। স্বর্ণকারাগারের সমস্ত ঐশ্বর্য পাইলেও মৃত্যুঞ্জয় এক কণা অপব্যয় করিত না, সমস্তই বংশসম্ভ্রম নামে দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিয়া দিত। ঠাকুরদা গল্পটি এই মনোভাবের আর একটি উদাহরণস্থল।

হৈমন্তী গল্পের পার্বতী হৈমন্তী মানুষ হইয়াছে ব্যক্তিত্বের খোলা হাওয়ায়, বিবাহের পরে আসিয়া পড়িল একান্নবর্তী পরিবারের প্রাচীন দুর্ভেদ্য দুর্গে। এই হাওয়া বদল তাহার সহ্য হইল না, গিরিলালিত শিশিরবিন্দু বংশমর্যাদার বিষবাষ্পে শুকাইয়া উবিয়া গেল।

বোষ্টমী গল্পের বোষ্টমী গুরুর একটুখানি লালসার ইঙ্গিতে স্বামী ও সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন? যে সমাজে লোকে বংশ-পরম্পরায় গুরুর কাছে নারীত্ব বিসর্জন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, সেখানে বোষ্টমীর ব্যবহার আতিশয্য মনে হইতে পারে। কিন্তু এ যে নূতন আবহাওয়া! বোষ্টমী নিজেকে বংশলতিকার একটি পুষ্প মাত্র মনে করিতে পারে নাই, পারিলে সংসার ত্যাগ করিত না; সে নিজেকে স্বতন্ত্র একটি সত্তারূপে, নারীরূপে দেখিয়াছিল; তাই ঐ লালসার আগুনে তাহার আশ্রয় পুড়িয়া গেল, তখন সংসার ত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় কি?

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির সঙ্গে পলাতকা কাব্যের 'মুক্তি' কবিতাটির আন্তরিক মিল। মৃণাল স্বামীকে লিখিতেছে,—"আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে

জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস ক'রে এই চিঠি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।" এ স্বামীর কাছে স্ত্রীর পত্র নয়, পুরুষের কাছে নারীর পত্র, গল্পটির নাম নারীর পত্র হইতে পারিত।

পনেরো বছরের পত্নী-জীবনের অভিজ্ঞতায়, অনেক গ্লানি স্বীকার করিয়া, অনেক দুঃখকষ্ট দেখিয়া মৃণাল বুঝিয়াছে যে, মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ পত্নীত্বে নয়, নারীত্বে। পত্নীত্ব নারীত্বের অংশ মাত্র, পূর্ণতা নয় আর পূর্ণতার সাধনাই জীবনের লক্ষ্য। মৃণালের সবল ব্যক্তিত্ব বৃথা বংশমর্যাদা ও ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডী বিদীর্ণ করিয়া নারীত্ববোধের মুক্ত আকাশে আপন ব্যক্তিত্বের শতদলটি বিকশিত করিয়া ধরিয়াছে। সে লিখিতেছে—"কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া ; কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী ক'রে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে। ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর। তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হ'তে এক নিমেষও লাগে না। তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আকাশের মেঘপুঞ্জ। তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে।···আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভাল লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।··· আমি বাঁচলুম।"

মেজোবউ মরিয়া নারীরূপে নূতন জন্মলাভ করিল। এ আনন্দ মুক্তির, এ বাঁচা নারীজীবনের সার্থকতার।

পূর্বে যে-দুটি সূত্রের কথা বলিয়াছি—যৌবনের আহ্বান আর নারীর মূল্যবোধ—স্ত্রীর পত্র গল্পটিতে তাহাদের সঙ্গম ঘটিয়াছে। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের যে আবহাওয়ায় মেজোবউয়ের যৌবন

অবহেলিত ছিল, শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া তাহার সৌন্দর্য সে দেখিতে পাইয়াছে, আর দেখিয়াছে যে, স্বয়ং বিধাতা সেই সুন্দরী নারীর আত্মদানের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। মানুষ যদি নারীর মূল্য দিতে অসমর্থ হয়, বিধাতা কার্পণ্য করিবেন না। এই বোধের চরিতার্থতাতেই মুক্তি।

এই বিষয়টিই পলাতকা কাব্যে মুক্তি কবিতাতে নির্গলিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মনে হয় যেন পদ্যটি গদ্যের রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। মৃণাল কবি হইলে, ঐ কবিতাটি স্বামীকে লিখিয়া পাঠাইতে পারিত। আর শুধু 'মুক্তি' কবিতাটিই বা কেন, পলাতকার অনেকগুলি কবিতাই ঐ ভাবে ভাবিত।

অপরিচিতা গল্পের কল্যাণী এবং তাহার পিতা শম্ভুনাথ সেন বাংলা দেশের যাবতীয় বর ও বরকর্তার সম্মুখে একটা স্পৃহণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। বিবাহটাই স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র পন্থা নয় এ কথা শম্ভুনাথ সেন জানিত, কাজেই বরকর্তার অসহনীয় জুলুমের কাছে আত্মসমর্পণ সে করে নাই। নারীর পক্ষে সংসারে যে অন্য দ্বার খোলা আছে এবং সে দরজাও মনুষ্যত্বলাভের পরিপন্থী নয়, কল্যাণী, পিতার উপযুক্ত পুত্রী তাহাই প্রমাণ করিয়াছে।

কোন কারণে কোন নারী স্বামী-পরিত্যক্ত হইলে আমাদের দেশে তাহার সম্মুখের আর-সব দরজা বন্ধ হইয়া যায়, খোলা থাকে কেবল পূজার্চনার এবং ব্রহ্মচারিণী সাজিবার পথটা। তপস্বিনী গল্পের নায়িকা ষোড়শীকে রবীন্দ্রনাথ সেই পথে বাহির করিয়া ঘটনাবিন্যাসের দ্বারা তাহার অবাস্তব হাস্যকরতা দেখাইয়া দিয়াছেন। যে স্বামীকে সে হিমালয়বাসী যোগী-রূপে ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল হঠাৎ তাহার বিদেশী "কাপড়-কাচা কল কোম্পানির ভ্রমণকারী এজেন্ট" রূপে প্রত্যাবর্তন অনাবশ্যক রূঢ় মনে হইতে পারে, কিন্তু সমাজের পক্ষে এরূপ আঘাতের তখন প্রয়োজন ছিল, এখনো আছে।

গ্রন্থকীট স্বামীর হাতে 'পয়লা নম্বর' গল্পের নায়িকা অনিলার

নারীমর্যাদা পূর্ণ মূল্য পায় নাই সে তাহার এক দুঃখ। আবার পাশের বাড়ির সিতাংশুমৌলি তাহার অবহেলিত নারীত্বের প্রতি যে লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল সে তাহার আর এক দুঃখ। এখন এই দুই দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় দুইজনকে একই বাণীর দ্বারা অনুশাসন করিয়া গৃহ ছাড়িয়া সে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে।

অতঃপর আর পাঁচটি মাত্র গল্প পাই, এগুলিতে নানাভাবের কথা আছে।"[৬৫]

নামঞ্জুর গল্প ও সংস্কার গল্পের বক্তব্য প্রায় এক। "অনেক বড় কথা কহা সহজ ; কিন্তু রাজনীতির উচ্ছ্বাসে বাস্তবের প্রশ্ন যখন আসে তখনই দেখা যায় মনুষ্যত্ব হইতে সংস্কার হয় প্রবল। নামঞ্জুর গল্পের অনিল অমিয়াকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প, কিন্তু যেমন সে অমিয়ার হীন জন্মের ইতিহাস জানিল, শুকাইয়া গেল তাহার প্রেম, সংস্কারে ও রুচিতে বাধিল। সংস্কার গল্পেও উৎপীড়িত মেথরকে গাড়িতে তুলিয়া রক্ষা করিতে সংস্কারে বাধা পাইল ; খদ্দরধারিণী শ্রীমতী কলিকা স্বামীকে বলে—মেথরকে গাড়িতে নিতে পারবো না।[৬৬]

বলাই গল্পটি শান্তিনিকেতনে ১৩৩৫ সালে শ্রাবণ মাসে বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে লিখিত ও পঠিত। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন—"গল্পটি নিঃসন্তান ধনী খুল্লতাত কর্তৃক লালিত একটি পিতৃমাতৃহীন বালকের কাহিনী, সে তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে উদ্ভিদের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিত।..ইহা ইতিহাস নহে, কিন্তু কবি বলেন যে, বাল্যকালে উদ্ভিদজীবনের প্রতি তাঁহার হৃদয়মনের ভাব ঐ বালকটির মতো ছিল।"[৬৭]

---

৬৫ নামঞ্জুর গল্প ১৯২৫, সংস্কার ও বলাই ১৯২৮, চিত্রকর ১৯২৯ এবং চোরাই ধন ১৯৩৩ সাল।

৬৬ রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, পৃ ২৩৫

৬৭ রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, পৃ ২৩৭

কয়েক মাস পরে লিখিত বনবাণী কাব্যের জগদীশচন্দ্র নামে কবিতাটিতে উদ্ভিদ্‌জীবনের সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্কের যে বর্ণনা কবি করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে বলাই গল্পের ঐ বিষয়ের বর্ণনার আন্তরিক মিল আছে এবং অনেক স্থলে সে মিল আক্ষরিকও বটে।[৬৮]

চিত্রকর গল্পের গোবিন্দ ও তাহার বিধবা মাতা ছবি আঁকে। কিন্তু কাহারো কাছে তাহারা উৎসাহ পায় না, কারণ ও বিদ্যায় পয়সা আসিবে না, তা-ছাড়া তাহাদের অঙ্কিত ছবিগুলাও অনেকের মতে ছবির পর্যায়ভুক্ত নয়। দরিদ্র পরিবার-ভুক্ত মাতাপুত্রের শিল্পজীবনের দুঃখের চিত্র সূক্ষ্ম করুণ রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে।[৬৯]

এই গল্প পাঁচটিতে শেষতম কোন একটি সাধারণ ভাবের সূত্র পাওয়া যায় না, নানা চলিত ভাবের ছায়াপাতে এগুলি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

ছয়

এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির সঙ্গে তাঁহার সমসাময়িক রচনার ভাবাত্মক যোগাযোগ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কোন একটি রচনার মধ্যে লেখকের সমগ্র মনের পরিচয় পাওয়া যায় না, অংশ-বিশেষের পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। এখন সেই রচনাটির সঙ্গে লেখকের তৎকালীন অন্যান্য রচনা যোগ করিয়া লইলে মনের প্রকাশ

৬৮ জগদীশচন্দ্র, ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫। কৌতূহলী পাঠকগণকে এই দুটি অংশ মিলাইয়া পড়িতে অনুরোধ করি।

৬৯ তিন সঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত রবিবার গল্পের নায়কও চিত্রকর, তাহার ছবিরও সমজদার এদেশে নাই; তাহার ইচ্ছা সে এবার বিদেশে যাইবে ছবিগুলোর গুণ যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে। এই সব গল্পে কবির নিজ চিত্রসাধনার অভিজ্ঞতা ছায়াপাত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পূর্ণতর হয়। তৎসত্ত্বেও সমগ্র মনের পরিচয় পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তার কারণ, প্রথমত (মনের প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল, তিন-চারমহলা বাড়ির মতো ; তার উপরে রচনাতেই যে।তাহার নিঃশেষ প্রকাশ এমন নয়, অনেক বাজে খরচ হয়, অনেক হাতে থাকিয়া যায়, সমগ্রের হিসাব সমগ্র রচনাতে কখনই পাওয়া যায় না। তবু যতটা বেশী পাওয়া যায় সেই আশাতে ছোটগল্পের সঙ্গে সমকালীন অনেক রচনাকে জোড়া দিয়া লইয়াছি। প্রধানত আমাকে কবিতা ও চিঠিপত্রের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, প্রসঙ্গত অন্যান্য রচনারও উল্লেখ করিয়াছি। এখন যদি কোন অধ্যবসায়ী সমালোচক তাঁহার গল্পগুলির সঙ্গে সমকালীন সমস্ত শ্রেণীর রচনার যোগাযোগ স্থাপন করেন, তবে অবশ্যই রবীন্দ্র-মানসের পূর্ণতর পরিচয় পাইবেন। তবে আমার বিশ্বাস কবি-মনের যে মানচিত্র আমি আঁকিয়াছি তাহা নানা তথ্যে পূর্ণতর হইয়া উঠিবে মাত্র, কিন্তু তাহার আয়তনের ও প্রকৃতির কোনরূপ বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটিবে না।

এবারে অন্য এক ভাবে ছোটগল্পগুলির বিচার করিব। সব দেশের সাহিত্যেই রচনার শ্রেণীভাগ করিবার রীতি বর্তমান। কেহ বা রচনার বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণীভাগ করেন, কেহ বা রচনার শিল্পপ্রকৃতি বা form অনুসারে শ্রেণীভাগ করেন। আমার মনে হয়, এ দুটির কোনটিই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। বিশেষ যেখানে রচনার পরিমাণ প্রচুর এবং সমগ্রে মিলিয়া জীবনের পূর্ণতর আভাস দিতেছে, সেখানে কোন কৃত্রিম শ্রেণীনির্ণয়-পন্থা অবলম্বন না করিয়া যতদূর সম্ভব জীবনের নিয়মকে অনুসরণ করা উচিত। মানুষ পিতামাতা ভ্রাতাভগিনী আত্মীয়স্বজন ও অনুচর-পরিচরের সংসারে জন্মগ্রহণ করে। শিশু জন্মিবামাত্রই কাহারো পুত্র, কাহারো পৌত্র, কাহারো ভ্রাতা, কাহারো আত্মীয় জ্ঞাতি। ইহাই তাহার স্বাভাবিক পরিবেশ, ইহাই তাহার স্বাভাবিক ও প্রাথমিক শ্রেণী-বিভাগ। মহৎ সাহিত্যের শ্রেণীনির্ণয়ে এই মৌলিক ধারাটিই অনুসৃত হওয়া উচিত বলিয়া মনে

হয়। হয়তো শিল্পরীতির বিচারে ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়, কিন্তু জীবন নীতির বিচারে ইহাই স্বাভাবিক, কেননা যে-মহৎসাহিত্যে জীবনচিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে জীবনের নিয়ম অনুসরণ অবিধেয় নয়। যাই হোক, এ তত্ত্বের মূল্য যত সামান্যই হোক, এখানে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির শ্রেণীনির্ণয়ে যতদূর সম্ভব ইহাকেই প্রয়োগ করিতে চাই।

রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হঠাৎ কোথা হইতে একটি বালিকার আবির্ভাব হয় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার মুখে প্রেম, করুণা ও মনুষ্যত্বের বাণী উচ্চারিত হইয়া মানুষের মনে একটা পরিবর্তন ঘটাইয়া দেয়।

বাল্মীকিপ্রতিভা নাটকে বালিকার ছদ্মবেশে সরস্বতী আবির্ভূত হইয়া বাল্মীকির মনে করুণা সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। অবশেষে সরস্বতী স্বমূর্তিতে আগমন করিয়া বাল্মীকিকে বলিতেছেন—

"দীন হীন বালিকার সাজে,
এসেছিনু ঘোর বন মাঝে
গলাতে পাষাণ তোর মন
কেন বৎস, শোন, তাহা শোন্।"

প্রকৃতির প্রতিশোধের বালিকা রঘুর দুহিতাও ঠিক অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সন্ন্যাসীর মনের উপরে। রঘুর দুহিতা আনিয়াছে প্রেমের বাণী। রাজর্ষি উপন্যাসের ক্ষুদ্র বালিকা হাসি মন্দিরের পাষাণ-সোপানবাহী রক্তধারার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এত রক্ত কেন? রাজা চমকিয়া অভ্যাসের জড়চিত্ততা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছেন, এখানেও বালিকার মুখে করুণার বাণী। এই সব বালিকা জানে না যে, কী পরিবর্তনের সূচনা তাহারা করিয়া দিতেছে।[১০]

---

১০ রজক-কন্যার কথায় লালাবাবুর সংসারত্যাগ—ইহারই যেন বাস্তব দৃষ্টান্তস্থল।

মালিনী নাটকের রাজকন্যা মালিনী এবং সতী নাটকের রমাবাঈকন্যা অমাবাঈও নূতন ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছে। তবে আগের উদাহরণগুলি হইতে এগুলি একটু স্বতন্ত্র, শেষোক্ত দুইজনের বয়স কিছু বেশি আর ইহাদের প্রচারিত বাণী তাহাদের জ্ঞানের অতীত নয়। যাই হোক, এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত আরও সংগ্রহ করিতে পারা যায় রবীন্দ্রসাহিত্যে, কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন আছে মনে হয় না।

গল্পগুচ্ছে এই শ্রেণীর অন্তত দুটি গল্প পাওয়া যায়, কাবুলিওয়ালা এবং দুর্বুদ্ধি। চার বছরের কন্যা মিনি এবং তাহার অদৃশ্য সঙ্গিনী রহমৎকন্যা মিনির পিতার মনে একটি অননুভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। কলিকাতার ধনী শিক্ষিত নাগরিক ও অশিক্ষিত নরঘাতী কাবুলিওয়ালার মধ্যে ভেদ ঘুচিয়া গিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে 'সেও পিতা, আমিও পিতা।' দুর্বুদ্ধি গল্পের নায়ক ছিল পাড়াগাঁয়ের নেটিভ ডাক্তার এবং দারোগার ঘনিষ্ঠ সহায় ও বন্ধু। ইহাতেই তাহার জীবনীর একটা আভাস পাওয়া উচিত। তাহার বারো তেরো বছরের কন্যা শশী ডাক্তারের প্রসাদপ্রার্থী সদ্য কন্যাশোকগ্রস্ত বৃদ্ধ হরিনাথের অবস্থা দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"বাবা, ঐ বুড়ো কেন তোমার পায়ে ধরিয়া অমন করিয়া কাঁদিতেছিল?"

কন্যার এই প্রশ্নটিই তাহার পিতার দুর্বুদ্ধির কারণ, যাহাতে তাহাকে দারোগার বন্ধুত্ব ও গ্রাম ছাড়িতে বাধ্য করিল।

মিনি, শশী, হাসি ও রঘুর দুহিতা কেহই জানে না তাহাদের আচরণ ও বাক্য কী প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটাইয়া দিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ইহাদের এমন করিয়া মনুষ্যত্বের বাণীবাহক করিলেন কেন? হয়তো তাঁহার বিশ্বাস এই যে, 'জগৎপারাবারের তীরে' যে শিশুরা খেলা করে, জগৎরহস্যকে তাহারা খেলার নুড়ির মতোই সংগ্রহ করে; এখন এই রকম দুই একটি নুড়ি যদি তাহারা সংসারের অভ্যস্ত জড়তার প্রতি লীলাচ্ছলে নিক্ষেপ করিয়া বসে, তাহাতে বিস্মিত

হইবার কিছুই নাই। আমার এই বক্তব্য কতখানি সত্য জানি না, তবে এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া রাখিতেছি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার বিখ্যাত Ode on Intimations of Immortality কবিতায় যে তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জগৎপারাবারের তীরে' ক্রীড়ারত শিশুর এই তত্ত্বের কতখানি মিল তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

এই শিশুতত্ত্বের সূত্রে বাহুল্য হইলেও মনে করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, শিশু ও বালকবালিকার জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ও সমবেদনা অসীম। স্বভাবতই গল্পগুচ্ছের অনেকগুলি গল্প বালকজীবনসম্পর্কিত।[৭১] এই সব গল্পের বালক নায়কগণ বিচিত্র প্রকৃতির। ছুটি গল্পের ফটিক আপন পরিবেশ হইতে ছিন্ন হইয়া শুকাইয়া মারা গেল; আর অতিথি গল্পের তারাপদ নদীস্রোতে ভাসমান উদ্ভিদ্, পাছে কোন বিশিষ্ট স্থান তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে তাই বিবাহের পূর্বদিন সে গৃহত্যাগ করিল।

ফটিকও একশ্রেণীর উদ্ভিদ্ এবং অধিকাংশ উদ্ভিদের মতোই পরিবেশচ্যুত হওয়াতে নিষ্ফল হইয়া মারা গেল। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান যে, শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ আবশ্যক। শিশুর অনুকূল পরিবেশলাভই তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-লাভ, তাহার স্বভাব ও অভাব শিশুর পক্ষে জীবনমরণের কারণ হইতে পারে। তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া ছুটি গল্পটি পড়িলে গল্পটি ও শিক্ষাতত্ত্ব দুইই পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

মাস্টার-মশাই ও ভাইফোঁটা গল্প দুটির নায়ক বেণুগোপাল বা সুবোধ নয় সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রভাবেই গল্প দুটি গতিপ্রবণ এবং গল্পের নায়ক দুজনের মন সঞ্চালিত হইয়াছে। শেষজীবনে লিখিত

৭১ গিন্নি, ছুটি, অপবাদ, অতিথি, মাস্টার-মশায়, ভাইফোঁটা, বলাই চিত্রকর প্রভৃতি।

বলাই ও চিত্রকর গল্প দুটি প্রমাণ করে যে, বালকজীবন সম্বন্ধে কবির কৌতূহল সমান অক্ষুণ্ণ ছিল, হয়তো বা বাড়িয়াই থাকিবে।[৭২]

বালিকা-বধূর দুঃখ আমাদের সমাজে একটি লজ্জাকর শোচনীয় ঘটনা। প্রথম শ্বশুরকুলে গিয়া বালিকা-বধূকে যে দুঃখ ও গ্লানি সহ্য করিতে হয়, প্রাচীন ও নব্য বাংলা-সাহিত্য তাহার চাপা ক্রন্দনে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পেও তাহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। কবি-লিখিত প্রথম ছোটগল্পটি বালিকা-বধূ নিরুপমার অশ্রুজলে করুণ। তাহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে বিবাহের পণ বাকি থাকাতে। এমন অবস্থায় সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে, অবহেলায় ও অ-চিকিৎসায় শ্বশুরকুল-ত্যাগের একমাত্র পথে সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তার পরে 'এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।'

খাতা গল্পটিতে বালিকা-বধূ উমার অবস্থাও সুসহ নয়; তবে নিরুপমার মতো পরিণাম তাহার ঘটে নাই, তাহার হইয়া তাহার রচনাপূর্ণ খাতাখানি অনেক গ্লানি ও কটূক্তি সহ্য করিয়াছে।

সমাপ্তি ও শেষের রাত্রির মৃন্ময়ী ও মণিও বালিকা-বধূ। বালিকা-বধূর কাছে শ্বশুরকুল যে অসহ্য বোধ হয়, তাহার কারণ, যে শক্তির বলে সমস্তই সহ্য করা যায়, সেই প্রেম জাগ্রত হইবার আগেই কন্যার বিবাহ হয়। মৃন্ময়ী ও মণির দুঃখ অজাগ্রত প্রেমের দুঃখ। মৃন্ময়ী শ্বশুরকুলে খুব বেশি অনাদর পায় নাই, মণি তো রীতিমতো আদরেই ছিল। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে তখনো প্রেমের জাগরণ না ঘটায় সমস্তই তাহাদের কাছে বিরস ও অর্থহীন মনে হইয়াছিল। মৃন্ময়ীর প্রেমের জাগরণ গল্পের সীমার

---

৭২ শেষজীবনে লিখিত ছড়া, ছেলেবেলা, গল্পসল্প, সে প্রভৃতি পুস্তক তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

মধ্যেই ঘটিয়াছে, কিন্তু মণির প্রেমের অরুণোদয় গল্পের দিগন্তের পরপারে।[৭৩]

হৈমন্তী ও অপরিচিতা গল্পের হৈমন্তী ও কল্যাণী বয়সে ঠিক বালিকা না হইলেও বালিকা-বধূর দুঃখ ও দুঃখের সম্ভাবনা হইতে মুক্তি পায় নাই। বালিকা-বধূর দুঃখের একটি প্রধান কারণ, স্বামীর অসহায় ক্লৈব্য। আমাদের সমাজের ছেলেরা অন্য ক্ষেত্রে যেমনি হোক, বিবাহের বেলায় রামের মতো সুপুত্র। তাহারা অসহায়ভাবে বধূর অপমান ও অনাদর দেখে এবং অঙ্গুলিটি মাত্র উত্তোলন করে না। ইহাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর ধিক্কার। হৈমন্তীর স্বামী নিষ্ফল আক্রোশে নিজের প্রতি বলিয়াছেন—'যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহু যুগের যে শিক্ষা, তাহা কী করিতে আছে।' বংশ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিলে ব্যক্তিকে বিসর্জন দিবার শিক্ষাই পুরুষের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে দাম্পত্যজীবনের মধুর ও প্রেমময় চিত্র বড় চোখে পড়ে না, যেখানে আছে—পাত্রপাত্রীর সেখানে গৌণ ভূমিকা। ইহার একটি কারণ, অনেক সময়ে দম্পতির জীবনে নানাবিধ জটিল সমস্যা আসিয়া পড়িয়া দাম্পত্য-সম্বন্ধকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এমন কয়েকটি ছোটগল্প পাই, যাহাতে দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য কোন আঘাতের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তারাপ্রসন্নের কীর্তি এমনি একটা গল্প। স্বামীর লেখক-জীবনের ব্যর্থতা ভগ্নহৃদয় দাক্ষায়ণীর মৃত্যুর একটি কারণ হইলেও

৭৩ শেষের রাত্রি লিখিবার সময়ে আমাদের সমাজে মেয়ের বিবাহ-বয়স কিছু বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ সময়ে কল্পিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নারীর তুলনায় মণির বয়স কম বলিয়া মনে হয়।

স্বামীর প্রতি তাহার বিশ্বাস ও প্রেম টলে নাই। স্বর্ণমৃগ গল্পের বৈদ্যনাথের স্ত্রীর মতো দাক্ষায়ণীও স্বামী তারাপ্রসন্নকে স্বর্ণমৃগ শিকারে পাঠাইয়াছিল সত্য। আর সে কি স্বর্ণমৃগ! সবচেয়ে অনিশ্চিত ও চঞ্চল! পুস্তক-রচনা ও বিক্রয়লব্ধ অর্থরূপ স্বর্ণমৃগ। বৈদ্যনাথ ও তারাপ্রসন্ন দুজনেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, অথচ অভ্যর্থনায় কী প্রভেদ!

দাম্পত্যপ্রেমের আর-দুটি গল্প প্রতিহিংসা ও চোরাইধন। গল্প দুটিতে দম্পতির সংলাপ শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সঙ্কোচ বোধ হয়, মনে হয়, আর কান পাতিয়া শোনা উচিত হইবে না। এমন পরস্পরনির্ভর দম্পতির প্রেমমধুর চিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল।

এই সূত্রে আর একটি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। সেটাও দম্পতি-সম্পর্কিত, কিন্তু কত ভিন্ন! হিন্দু সমাজে পুরুষের এক পত্নী বর্তমানে অনায়াসে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ এক জটিল সমস্যা। আইনের শাসন ও সামাজিক অনুশাসন এখনো ইহার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে নাই। এখন বহুবিবাহ আর বড় ঘটে না সত্য, কিন্তু সে ছিদ্রপথটা আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয় নাই। সাহিত্যের কাজ সমস্যার সমাধান নয়, সমস্যার চিত্রণ। প্রাচীনকালে বহুবিবাহ সমস্যা ছিল না, স্বীকৃত ছিল, নব্যকালের কাছেই তাহা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। নব্য বাংলা-সাহিত্যের অনেক লেখক এই সমস্যাটিকে নানাদিক হইতে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যও তাহার ব্যতিক্রম নয়।

ইংরেজি-পড়া নব্য মন লইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন সমাজের চিত্র আঁকিবার সময়ে অনায়াসে এক পুরুষের একাধিক পত্নীর ছবি আঁকিয়াছেন সত্য, কিন্তু হাল আমলে আসিয়া ঘটনাচক্রে পুরুষের দুই বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেও দুই স্ত্রীকে একত্র ঘর করিতে দেন নাই। ইহা কেবল ইংরেজি-পড়া মনের ধারণামাত্র নয়। নারী স্বভাবতই একঘরে। এক রাজ্যে দুই রাজা সম্ভব হইতে পারে

কিন্তু এক গৃহে দুই পত্নী? অসম্ভব। মধ্যবর্তিনী ও নিশীথে গল্প দুটি এই সমস্যার রবীন্দ্রভাষ্য। দ্বিতীয় বিবাহের পরে দক্ষিণাবাবু ও নিবারণের জীবন বিষময় হইয়া পড়িয়াছিল। নিবারণের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শৈলবালা মরিয়াও মরে নাই, অদৃশ্য খড়্গের মতো স্বামী-স্ত্রীকে ভিন্ন করিয়া মধ্যবর্তিনী হইয়া রহিয়াছে। আর প্রথম পক্ষের মৃত স্ত্রীর স্মৃতি দক্ষিণাবাবুকে উন্মাদ না করা অবধি ক্ষান্ত হয় নাই।[৭৪]

আর কয়েকটি গল্প আছে যাহাদের বিষয় ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্য।[৭৫] আমাদের সমাজে ভ্রাতৃসৌহার্দ্য অতিশয় প্রবল, তাহার একটি কারণ একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, আর একটি কারণ পারিবারিক

৭৪ এই প্রসঙ্গে দুই বোন ও মালঞ্চ আলোচনার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সমস্যার সঙ্গে 'দুই নারী'-তত্ত্ব জড়িত বলিয়া মনে হয়। নারীর কাছে পুরুষে যুগপৎ মাতৃস্বাদ ও প্রিয়াস্বাদ প্রত্যাশা করে। কোন একটির পূরণ না হইলে, আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থায় প্রিয়াস্বাদ পূরণ হইবার আশা অল্প, দ্বিতীয় বিবাহের দ্বারা পুরুষ সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে উদ্যত হয়। আমার বিশ্বাস, সমস্ত সমস্যাটিকে রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। দক্ষিণাবাবু, নিবারণ, শশাঙ্ক ও আদিত্য সকলেরই জীবনে প্রিয়াস্বাদ অনুভূতির স্থান শূন্য ছিল—সেই শূন্যতা পূর্ণ করিবার ইচ্ছাতেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে, নিবারণ ও দক্ষিণাবাবুর দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ এবং আদিত্য ও শশাঙ্কের সেই উদ্যম। নীরজার মৃত্যুর পরে এবং অল্প পরে আদিত্য যে সরলাকে বিবাহ করিয়াছিল, এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই। আরও একটি বিষয় আলোচনার যোগ্য। আদিত্যর স্ত্রী ব্যতীত আর তিনজনের পত্নীই স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। এই আত্মঘাতী বুদ্ধির কারণ কি? রবীন্দ্রনাথ একটি কারণ দেখাইয়াছেন, তিন-জনেই রুগ্‌ণ ও রোগগ্রস্ত ছিল। ইহাই কি যথেষ্ট কারণ? ইহা স্বামীর প্রেমের একপ্রকার পরীক্ষা নয় তো? যাই হোক, বিষয়টি নারীমনস্তত্ত্ববিশারদ-গণের প্রণিধানযোগ্য।

৭৫ ব্যবধান, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, দিদি, দান-প্রতিদান, পণরক্ষা।

বন্ধনের ঘনিষ্ঠতা। অবিভাজ্য সম্পত্তি এই বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়াছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া গেলে বন্ধনেও শিথিলতা ঘটে, কিন্তু ঐরূপ শিথিলতা ঘটিবার আগে ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্বন্ধের উপরে একটা কঠিন টান দিয়া যায়, হৃদয় ফাটিয়া রক্ত পড়ে। ব্যবধান গল্পটি এইরূপ রক্তপাতের কাহিনী।

নাবালক ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত দিদি গল্পের নায়িকা দিদি আত্মদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেক সময়ে আবার সম্পত্তিই ভ্রাতৃবন্ধন-শিথিলতার কারণ ঘটায়, দান-প্রতিদান গল্পে ছোট ভাই কৌশলে ইহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার লোভ সম্পত্তির প্রতি নয়, দাদার হৃদয়ের প্রতি।

আমাদের সমাজ সূক্ষ্ম, জটিল ও ব্যাপক পারিবারিক বন্ধনবহুল একটি বিচিত্র সংস্থা। এখানে দূর ও নিকট জ্ঞাতি, আত্মীয় এবং নিকট-আত্মীয়, বহু নরনারীর বিচিত্র সমাবেশ। ইহাতে যেমন মাধুর্য আছে তেমনি সঙ্কটও আছে, আর সবসুদ্ধ মিলিয়া একটি বৈচিত্র্য আছে। কোন বাঙালী লেখকের পক্ষেই ইহাকে অবহেলা করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কজালকে অস্বীকার করেন নাই, বরঞ্চ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিচিত্র গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবর ও ভ্রাতৃবধুর সম্বন্ধ (নষ্টনীড়), শালী ও ভগ্নীপতির সম্বন্ধ (রাজটিকা), জা-গণের সম্বন্ধ (জীবিত ও মৃত), পিতামহ ও নাতনীর সম্পর্ক (ঠাকুরদা), শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সম্পর্ক (প্রায়শ্চিত্ত) এবং বৈবাহিকদের সম্বন্ধ (দেনা-পাওনা, হৈমন্তী, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ) প্রভৃতি যাবতীয় সম্পর্ককে যথাযথভাবে কখনো মধুর স্বাদে, কখনো তিক্ত স্বাদে বাস্তবানুগরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সমস্ত গল্পই যে সমান রসোত্তীর্ণ তাহা নয়, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার দৃষ্টির সমগ্রতা এবং তথ্যানুগত্য।

এই সমাজে ভৃত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে। সে বৃত্তিভুক্ নয়, অনেক সময়েই হৃদয়ের স্নেহবৃত্তিরও অংশভুক্। সেইজন্যই

এখানে পুরাতন ভৃত্য 'কেষ্টা' অনায়াসে প্রভুর জন্য প্রাণদান করিতে পারে। কিন্তু খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পের রাইচরণ তাহার চেয়েও বেশি করিয়াছে। প্রাণ নয়, প্রাণাধিক পুত্রকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করিয়া সে প্রভু-ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য গ্রাম্য পোস্ট-মাস্টার বিদায় হইয়া গেলে (পোস্টমাস্টার) রতনের কাছে সংসার এমন শূন্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

আমাদের সামাজিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের উপরে অনেকগুলি গল্পের প্রতিষ্ঠা। এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে গল্পগুলির পূরা রস আদায় করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার ইহাও সত্য যে, এই শ্রেণীর গল্পের ক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। গল্পগুচ্ছ যখন লিখিত হইতেছিল তখনো আমাদের সমাজে পল্লীর যে গুরুত্ব ছিল এখন তাহা কমিয়া আসিয়াছে। তখনো মধ্যবিত্ত সমাজের প্রধান আশ্রয় ছিল গ্রাম ও পৈতৃক জোত-জমা এবং বিষয়-সম্পত্তি। ইতিমধ্যে ভারসাম্য বিচলিত হইয়া মধ্যবিত্ত সমাজের বৃহৎ এক অংশ চাকুরি বা বেকার-জীবন অবলম্বন করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজ সম্বন্ধে এ কথা সর্বথা প্রযোজ্য না হইলেও, গল্পগুচ্ছের জীবনপরিধি বঙ্গের যে-অংশাবলম্বী তাহার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সত্য; সেই সমাজের সুবৃহৎ এক অংশ আজ উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া গল্পগুলির ক্ষেত্রকে আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। অতঃপর ভূমির চিরস্থায়ী ব্যবস্থা লোপ পাইলে দানপ্রতিদানের মতো বা প্রতিহিংসার মতো গল্প লিখিবার আর হেতু থাকিবে না। গল্পগুচ্ছে দুটি বড় জমিদার-বংশের কাহিনী আছে; কিন্তু দুটিরই ভগ্নদশা। জমিদারী প্রথা সমূলে লোপ পাইলে তখন অনেক ঘরেই নয়ানজোড় ও শানিয়াড়ির বাবুদের আবির্ভাব হইবে এবং এক পুরুষ পরে ঐ শ্রেণীর গল্প লিখিবার আর কারণ থাকিবে না।[৭৬]

৭৬ ঠাকুরদা ও রাসমণির ছেলে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অবশ্য লিখিত হইতে পারিবে।

এ সমস্তই সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গল্পগুচ্ছের সমগ্রতাকে আধুনিক পল্লীবঙ্গের পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনেক রচনায় পল্লীবঙ্গের চিত্র আছে; কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আছে, অনেকের লিখিত ধর্মমঙ্গলে ও মনসামঙ্গলে আছে, পূর্ববঙ্গগীতিকাসমূহে আছে; গল্পগুচ্ছও তেমনি পল্লীবঙ্গের আর একটি চিত্র। মধ্যযুগের সেই সব রচনার সঙ্গে অন্য বিষয়ে বা অন্য কারণে গল্পগুচ্ছের তুলনা করা উচিৎ হইবে না; পরিবেশ পরিবর্তিত—দৃষ্টি পরিবর্তিত, প্রাচীন ও নব্য লেখকের প্রতিভাতেও বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন ও নব্য লেখক একই কাজ করিয়াছেন, পল্লীবঙ্গের পুরাণ-কথা লিখিয়াছেন। কবিকঙ্কণচণ্ডীর বাংলার আজ সম্যক পরিবর্তন ঘটিয়াছে; কিছুকাল পরে গল্পগুচ্ছের বাংলাদেশেরও সম্যক্ পরিবর্তন ঘটিবে। তখন পাঠকে, আজ যেমন কবিকঙ্কণচণ্ডীর দর্পণে সেদিনকার বাংলাদেশকে দেখে, তেমনি গল্পগুচ্ছের নখদর্পণে পল্লীলঙ্গের একটি লুপ্তপ্রায় যুগকে দর্শন করিতে পারিবে। তখন গল্পগুচ্ছের প্রকৃত মূল্য লোকে বুঝিতে পারিবে, বুঝিতে পারিবে যে, পুরাণ-কথা কেন কখনো পুরানো হয় না।

এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম তাহাতে গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পকেই স্পর্শ করিয়াছি। কিন্তু অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্প বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে রবীন্দ্রনাথের অতি-প্রাকৃত গল্প সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সারিয়া লই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ অতিপ্রাকৃত গল্প একটিও লিখিয়াছেন কি না আমার সন্দেহ আছে। অতিপ্রাকৃত বলিয়া কথিত তাঁহার অধিকাংশ গল্পই রসোত্তীর্ণ, কিন্তু সেগুলিতে যথার্থ অতিপ্রাকৃতের রস আছে কি?[৭৭]

(অতিপ্রাকৃত একটি বিশেষ রস। তাহাতে রোমাঞ্চ হইবে, গা শির্ শির্ করিয়া উঠিবে, পিছনে তাকাইতে ভয় হইবে অথচ সে

৭৭ কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা, মাস্টার-মশাই।

লোভ সংবরণ করাও সহজ হইবে না, আর গল্প পড়া শেষ হইয়া গেলে অন্ধকার ঘরে একাকী প্রবেশ করিতে দ্বিধাবোধ হইবে। আরও অনেক লক্ষণ থাকিতে পারে কিন্তু এইগুলিই অতিপ্রাকৃত গল্পের স্থায়ী লক্ষণ। কবির অতিপ্রাকৃত গল্পগুলিতে এই সব লক্ষণ কি-পরিমাণ আছে? কঙ্কালের প্রেতাত্মা এমন একটি মোহিনী কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছে, তাহার মনে জীবনের সুখ-দুঃখের প্রভাব এখনো এমন প্রবল যে, জীবনোত্তর রহস্যের আভাস সে বড় দিতে পারে না; গল্পটি রসোত্তীর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু সে রসকে অতিপ্রাকৃত মনে করি না।

ক্ষুধিত পাষাণ বাংলা-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, কিন্তু তাহা কি সত্যই অতিপ্রাকৃত? মোহন তুলির সাহায্যে কবি আমাদের মনকে এমন এক কল্পনার স্বর্গে উত্তোলন করেন যেখানে সাংসারিক সুখ-দুঃখ নাই, এবং সেই সঙ্গে যে গা-ছমছম ভাব রক্তমাংসকে অবলম্বন করিয়া বিরাজ করে তাহাও নাই। গল্পটি পড়িবার সময়ে পাঠকে অনেক পরিমাণে অতীন্দ্রিয় সত্তা লাভ করে, পাঠকই যেন অতিপ্রাকৃত হইয়া পড়ে; অতি-প্রাকৃতের আবার অতিপ্রাকৃতের ভয় কিসের? বরঞ্চ তাহার ভয় প্রাকৃতের; কখন্ এ মোহ ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রাকৃত জগতে ফিরিয়া যাই, এইরূপ একটা সূক্ষ্ম উদ্বেগ যেন তাহাকে পীড়িত করিতে থাকে। চিনি হইয়া গেলে আর চিনির স্বাদ পাওয়া যায় না। এইজন্যই গল্পটিকে আমার অতিপ্রাকৃত বোধ হয় না।

মণিহারা গল্পে অলঙ্কারবিভূষিত কঙ্কালের শিঞ্জিত পদধ্বনি মনে রহস্যাতুর ভাব জাগায় সত্য, কিন্তু গল্পের উপসংহার কি সেই ভাবটিকে ব্যঙ্গ করিয়া উড়াইয়া দেয় না? গল্পের মধ্যে ঐ ঘটনাটিকে অতিপ্রাকৃতরস-সম্পন্ন বলা চলিলেও, সমস্ত গল্পটি মানুষের অতি-প্রাকৃত সম্বন্ধে বিশ্বাসকেই যেন অস্বীকার করিতেছে!

অনেকে আবার জীবিত ও মৃত এবং নিশীথে গল্পকেও অতিপ্রাকৃত বলিয়া থাকেন। আলোচনা হইতে এ দুটিকে বাদ দিতে পারি।

মাস্টার-মশাই গল্পের প্রথমাংশ যথার্থ অতিপ্রাকৃত রসের উদাহরণস্থল। অন্ধকার রাত্রে, নির্জন মাঠের মধ্যে, বন্ধ গাড়ির অভ্যন্তরে কায়াহীনের সেই দুটি উজ্জ্বল চক্ষু, পাশের জায়গাটির বাষ্পময় কায়াতে ভরিয়া ওঠা, কয়েক বৎসর আগে হরলালকে বহন করিয়া গাড়িখানি মাঠের মধ্যে যে পথে আবর্তিত হইয়াছিল সেই পথ, সেই গাড়ি, সেই রাত্রি সত্য সত্যই রোমাঞ্চ ঘটাইয়া দেয়, অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় সেই দুটি চক্ষু আমাকেও দেখিতেছে কি না, পাশের জায়গাটি সত্যই ভরিয়া ওঠে নাই তো! ইহাই যথার্থ অতিপ্রাকৃতের লক্ষণ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাই মনে করি যে, রবীন্দ্রনাথ আধখানা মাত্র অতিপ্রাকৃত গল্প লিখিয়াছেন, মণিহারার কঙ্কালের পদধ্বনিকে গণনা করিলে সওয়া একখানা। কিন্তু গল্প চারটি গল্প হিসাবে অতিপ্রাকৃত রসে সমৃদ্ধ হোক বা না হোক শিল্প হিসাবে যে রসোত্তীর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

জীবিত ও মৃত এবং মহামায়া দুটি আশ্চর্যরকমের গল্প। প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয়, গল্প দুটির মধ্যে কাহিনীবিন্যাসের চমৎকারিত্ব আছে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সাধারণত যেমন অকিঞ্চিৎকর ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া ওঠে, এগুলি তেমন নহে। কহিনীবিন্যাস-কৌশলকে রবীন্দ্রনাথ কখনো তেমনভাবে গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু যখনি করিয়াছেন অপ্রত্যাশিত নিপুণতা দেখাইয়াছেন। জীবিত ও মৃত গল্পটির মূলে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।[৭৮] মহামায়া গল্পের ঘটনাটি সমসাময়িক নয়, সতীদাহ-নিবারণের পূর্ববর্তী সময়ের। যদিচ গল্প দুটিতেই প্লটের বা কাহিনীবিন্যাসের অভিনবত্ব বর্তমান, তবু রসকেন্দ্র কাহিনী নয়, কাদাম্বনী ও মহামায়ার বেদনা। সংসারের হাতে অবহেলা ও পীড়ন ছাড়া তাহারা আর কিছুই পায় নাই, তবু শ্মশান হইতে মুক্তি পাইবামাত্রই তাহারা আবার সেই

৭৮ রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ ২৪৯

সংসারেই ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো বৃক্ষে আর তাহাদের স্থান হয় নাই। অবশেষে কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে, সে মরে নাই, আর মহামায়া সংসার ছাড়িয়া আবার কোন্ নিরুদ্দিষ্টতার মধ্যে প্রস্থান করিল। মানুষ শ্মশানস্থ হইলে তারপরে ঘরে ফিরিয়া আসিলেও রহস্যময় হইয়া বিরাজ করে, সংসারী মানুষ সে রহস্য সহ্য করিতে পারে না, কাজেই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, এমন কি সর্বজয়ী প্রেমও এখানে শক্তিহীন। মনস্বিনী মহামায়া সংসার ত্যাগ করিয়া ঠিক পথই অবলম্বন করিয়াছিল, কারণ তাহার রূপদগ্ধ মুখ দেখিবার পরে রাজীব আর তাহাকে কখনোই আগের চোখে দেখিতে সক্ষম হইত না। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে দুঃখ দিবার ও পাইবার চেয়ে সংসারবাস ত্যাগ করাই সুবিবেচনার কাজ, ইহাই ছিল মহামায়ার ধারণা। রাজীবকে দীর্ঘতর দুঃখ ও আত্মগ্লানি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই মহামায়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল, এখানে তাহার বিরাগের মূলেও অনুরাগ। রাজীব না হয় বাঁচিল,—কিন্তু মহামায়া? তাহার চাপা দীর্ঘনিশ্বাস গল্পটির মধ্যে সমীরিত না হইলেও পাঠকের বুকের মধ্যে অনুভূত হইতে থাকে।

দৃষ্টিদান আর একটি আশ্চর্য করুণ গল্প। কুমুদিনী অন্ধ হইবার পরে স্বামীর সেবা ও সাহচর্য যখন আরও বেশি করিয়া পাইতে লাগিল, সেই কৃতজ্ঞতার বশে স্বামীকে আর একটি বিবাহ করিতে সে অনুরোধ করিল। কিন্তু শেষে স্বামী যখন বিবাহ করিতে যাত্রা করিতেছে তখন কুমুদিনী ভ্রমরের মতোই, প্রায় অনুরূপ ভাষাতেই, বলিয়া উঠিল—"যদি আমি সতী হই, তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনমতেই তোমার ধর্ম শপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।" এ বিষয়ে কৃষ্ণকান্তের উইল লিখিত হইবার পরে দেশের ধারণা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? দ্বিতীয়বার বিবাহিত

পুরুষ সুখী হইল ইহা লিখিতে সংস্কারপীড়িত বাঙালী লেখকের কলম কাঁপে, আর দ্বিতীয়বার বিবাহিত নারীর কথা এখনো লেখকে প্রবলভাবে, সম্পূর্ণভাবে কল্পনা করিতেই দ্বিধা বোধ করে। আগের দুটি গল্পের ন্যায় এখানেও দেখি কুমুদিনী এবং তাহার স্বামী ও সংসারের মধ্যে রহস্যময়তা একটি সূক্ষ্ম যবনিকার অন্তরালের সৃষ্টি করিয়াছে। "সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব ঝকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।"

প্রতিহিংসা গল্পের নায়িকা ইন্দ্রাণী আর যাহাই হোক তেমন সামান্যা রমণী নয়, আবার সে দেবীও নয়। বাহিরের লোকের কাছে সে দেবতার ন্যায় দূরবর্তিনী, স্বামীর কাছে সামান্য রমণী; ইন্দ্রাণী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, দেবত্ব ও নারীত্বের মধ্যে সে একটি ভারসাম্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই ক্ষমতার মূলে তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-প্রভাব। বস্তুত সে জয়কালী ও রাসমণির সগোত্র। ইন্দ্রাণীর স্বামীসান্নিধ্যমিলনলীলায় ঐ দুটি নারী-জীবনের অনঙ্কিত একটি চিত্র যেন দেখিতে পাই।

শাস্তি গল্পটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে রবীন্দ্রনাথের কলম সামাজিক মর্যাদার মানে নিম্নতম একটি পরিবারের সুখ-দুঃখের একটা কাহিনীকে স্পর্শ করিয়াছে। গল্পটির রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে সকলে একমত না হইতেও পারেন কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে ইহার উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই। ঠিক এই জাতীয় ঘটনা রবীন্দ্রনাথের স্বচক্ষে দেখিবার নয়, লোকমুখে শুনিয়া থাকিবেন; এখন সেই পরোক্ষ জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া দিনমজুর রুই পরিবারের নরনারীর এমন

সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্রাঙ্কনে যে কতখানি শক্তির প্রয়োজন ভাবিলে বিস্ময়বোধ হয়। যাহারা প্রচণ্ডভাবে বাস্তব, ভাবের লঘু বাষ্পটুকুও যাহাদের মধ্যে বিরল, এমন চরিত্র রবীন্দ্রনাথ যখনই আঁকিয়াছেন, অসামান্যতা দেখাইয়াছেন; দৃষ্টান্ত পান্নুবাবু, কৈলাস, হরমোহিনী, নরেন মিটার প্রভৃতি; গল্পগুচ্ছেও এরূপ চরিত্র যথেষ্ট আছে; রুই পরিবার তাহাদের অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সংসারে যত-সংখ্যক নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন আর কোন বাঙালী সাহিত্যিক করেন নাই; তাঁহার কাব্য-নাট্য ও ছোটগল্পের পাত্রপাত্রীর একটা তালিকা ও বিবরণ প্রস্তুত করিতে পারিলে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে বলিয়া মনে হয়। এখানে আমরা তাঁহার ছোটগল্পের পাত্রপাত্রী ও তাহাদের সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। কেবল সংখ্যার বিচারে নয়, বৈচিত্র্যের বিচারেও ইহারা সত্যই বিস্ময়কর। ইহাদের মধ্যে বদ্রাওনের নবাবকন্যা হইতে হতভাগ্য রাইচরণ, শানিয়াড়ি ও নয়ানজোড়ের বাবুগণ হইতে দিনমজুর রুই পরিবারের নরনারী সকলেই আছে। সামাজিক শ্রেণীর সা হইতে নি পর্যন্ত স্বরগ্রামের সবগুলি সুরের স্পন্দনই যেন কবির স্পর্শকাতর লেখনীতে ধরা দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেমন শা-সুজার কন্যা আছে, তেমনি তাহার পালক পিতা বৃদ্ধ ধীবরও আছে; এ-আসর অতিশয় প্রশস্ত, তাই এখানে গ্রামের বোষ্টমী, ব্রাহ্মণ জমিদারের যবনীপুত্র, প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী কাহারো স্থানের অভাব হয় নাই; এমন কি, ছায়াশরীরিগণ ও রূপকথার নরনারীগণও একান্তে স্থানলাভ করিয়াছে। কবি কোন শ্রেণী বা বৃত্তিবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন নাই, নিজের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন, আর যেহেতু মানুষ সামাজিক স্তরভেদে বিন্যস্ত, যথাসাধ্য সেই সব স্তরীয় মানুষের কথা বলিয়াছেন। মধ্যবিত্ত স্তরের গল্পই সংখ্যায় বেশি সত্য, তার কারণ ঐ অংশটাই কবির জ্ঞানের পরিধির মধ্যে অধিকতর

উজ্জ্বল। কিন্তু তাই বলিয়া সমবেদনার তারতম্য ঘটে নাই। বজ্রাওনের নবাব-দুহিতা ও রুই পরিবারের চন্দরা, নির্বোধ রামকানাই ও পরাজিত শেখর কবি সকলেই কবিহৃদয়ের সমান সমবেদনার অংশ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের নরনারী সম্বন্ধে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য; আরও উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, কোন কোন সমালোচক তাঁহাকে শ্রেণীবিশেষ বা বৃত্তিবিশেষের কবি বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

উপন্যাস ও নাটকের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের সঙ্গে ছোটগল্পের চরিত্রের তুলনা করা উচিত হইবে না। আগেরগুলি যদি দর্পণের প্রতিবিম্ব হয়, শেষোক্তগুলি নখদর্পণের প্রতিবিম্ব। নখদর্পণের প্রতিবিম্বে থাকে সবই, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আলাদা করিয়া বুঝিবার উপায় থাকে না, অথচ তাই বলিয়া তাহাদের বস্তু-সত্যতা কম নয়। বরঞ্চ ছোটগল্পের চরিত্রের সঙ্গে কবিতার নরনারীর চরিত্রের তুলনা চলে; গল্পগুচ্ছের নরনারীর সঙ্গে কথা ও কাহিনীতে বা পলাতকায় বা ঐ শ্রেণীর কবিতায় অঙ্কিত চরিত্রের তুলনা চলিতে পারে। পুরাতন ভৃত্য কবিতার কেষ্টার চরিত্র ক'টি রেখায় অঙ্কিত? অথচ মনে হয় কোন কথাটি বাদ পড়ে নাই। আবার পোস্ট-মাস্টার গল্পের রতনের চরিত্র অঙ্কনে কয়টি রেখা লাগিয়াছে? তাহার সম্বন্ধে ইহার বেশি আর কি জানিবার প্রয়োজন ছিল? কাবুলিওয়ালার মিনি আর দেবতার গ্রাসের রাখাল ন্যূনতম রেখায় অঙ্কিত হইয়াও প্রবলতম প্রভাব বিস্তার করে না কি? পলাতকা কাব্যের মুক্তি কবিতা ও স্ত্রীর পত্র গল্পটির মধ্যে বাহনের প্রভেদ আছে, বাহিত সত্যের প্রকৃতি অভিন্ন। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, ছোটগল্পের নরনারীর এবং কাব্যের নরনারীর মধ্যে সৃষ্টি কৌশলের সমত্ব থাকায় তুলনা চলিতে পারে; কিন্তু উপন্যাসের নরনারীর সঙ্গে কদাচ নয়। কেননা, প্রভূততম তথ্যের সাহায্যেই উপন্যাস উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, আর ছোটগল্পের দীপ্তি বাড়ে তথ্যের ন্যূনতমতায়; উপন্যাসে অনেক সময়ে

অবান্তর কথাও রাখিতে হয়, ছোটগল্পে নিতান্ত আবশ্যক কথাটিকে রাখিতেও দ্বিধার অন্ত থাকে না ; উপন্যাস-শিল্পের প্রাণ গ্রহণে এবং আরও গ্রহণে, আর ছোটগল্পের প্রাণ বর্জনে এবং আরও বর্জনে।

এখানে ছোটগল্পের চরিত্রাঙ্কণে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা সহায়তা করিয়াছে। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, তাঁহার ছোটগল্পকে আমি লিরিক-ধর্মী বলিতেছি বা গদ্য লিরিক আখ্যা দিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, যেখানে যে-কেহ ছোটগল্প লিখিয়াছে, সে কবি হোক বা না হোক এই রীতিকেই অনুসরণ করিয়াছে। গীতিকবিতা ও ছোটগল্প দুই-ই তথ্যাল্পতা ও সূক্ষ্ম রেখার সাহায্যে গড়িয়া ওঠে। এখন কোন ছোটগল্প-লেখক যদি উপরন্তু গীতিকবিও হয়, তবে তাহার কিছু সুবিধা হইবার কথা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই সুবিধাটি ঘটিয়াছে। আবার অন্যত্র তাঁহাকে অসুবিধাতেও পড়িতে হইয়াছে। ছোটগল্পের ও উপন্যাসের চরিত্রাঙ্কণ-রীতির পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আগেই বলিয়াছি যে, উপন্যাসীয় চরিত্র তথ্যবহুল ও জটিল রেখায় গড়িয়া ওঠে। কিন্তু যদি কোন ঔপন্যাসিক মূলত গীতিকবি হন তবে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্বভাববিরোধী বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। গীতিকবির মনে, রবীন্দ্রনাথের মনে তথ্যের প্রতি একপ্রকার অসহিষ্ণুতার ভাব আছে, জটিল রেখাজালে নিজেকে দ্বিধাগ্রস্ত করিতে একপ্রকার সঙ্কোচের ভাব আছে। অথচ তথ্যবাহুল্য ও জটিল রেখাজালই উপন্যাসীয় চরিত্রের প্রাণ। এই আত্মদ্বিধার সঙ্কটের জন্যই রবীন্দ্র-উপন্যাসের অনেক নরনারীর চরিত্র, যাহাদের সূচনা রসোজ্জ্বল, তাহাদের উপসংহার কেমন যেন অতৃপ্তিকর। শুধু তাই নয়, যেহেতু উপন্যাসের ঘটনাবলী তথ্যবাহুল্যে পূর্ণাঙ্গ হইয়া ওঠে, তথ্যবাহুল্যের প্রতি কবির পূর্বোক্ত সূক্ষ্মবিতৃষ্ণার ফলে গোরা উপন্যাসখানি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্য সব উপন্যাসেরই উপসংহার কেমন যেন অসন্তোষজনক। এইসব করণেই দর্পণের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব এবং নখদর্পণের ক্ষুদ্রায়ত

প্রতিবিম্বের মধ্যে যে প্রভেদ স্বাভাবিক, তাহাকে স্বীকার করিয়া লইলে মানিতে হয় যে, তাঁহার ছোটগল্পের চরিত্রগুলি উপন্যাসের চরিত্রগুলি অপেক্ষা সার্থকতর।

চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ লাল, কালো, হলদে প্রভৃতি কড়া রঙ ব্যবহার করেন না। রঙের পরিভাষায় বলিতে গেলে নীল, সবুজ বা ঐ জাতীয় মিশ্র কোমল রঙ ব্যবহার করিতে তিনি অভ্যস্ত। তাহার ফলে চট্ করিয়া তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি চোখে পড়ে না; এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য কড়া রঙে আঁকা ছবির মতো সেগুলি চক্ষুকে আঘাতও করে না; গল্পগুচ্ছের নরনারী যেমন বিলম্বে চোখে পড়ে, তেমনি প্রাতঃকালের শেফালির মৃদু সৌরভের মতো সায়াহ্ন অবধি স্মৃতিতে বিলম্বিত হইয়াও থাকে। সমস্ত উচ্চাঙ্গ শিল্পের রসাস্বাদের ন্যায় গল্পগুচ্ছের যথার্থ রসবোধ সাধনাসাধ্য ব্যাপার। উদাহরণযোগে তুলনা করা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্রের মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ গল্প দুটি খুব জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার কারণ আর কিছুই নয়, অতিরঞ্জন, যাহাকে আমরা কড়া রঙের অপব্যয় বলিয়াছি। মহেশ বা অভাগীর স্বর্গের মতো ঘটনা আদৌ সম্ভব কি না, সে বিষয়েই আমার সন্দেহ আছে—অন্তত গল্পগুচ্ছের ভূখণ্ডে বা উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে কখনোই ঘটিতে পারিত না। পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলে এমন ঘটনা যদি সম্ভবও হয়, তবু তাহা সাধারণ অভিজ্ঞতার বস্তু নয়। এ কথা লেখক জানিতেন বলিয়াই কড়া রঙের পরে কড়া রঙের পোঁচ চালাইয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। শিল্পক্ষেত্রে কখনো কখনো চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হয় সত্য, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত আঙুলটা না চোখে ঢুকিয়া যায়। এখানে সেই বিপত্তি ঘটিয়াছে বলিয়া আমার আশঙ্কা। আর চোখে আঙুল ঢুকিয়া গেলে চক্ষুষ্মান্ পাঠকের আপত্তি হইবে, ইহাও খুব সম্ভব। গফুর দারিদ্র্যের অনুরোধে প্রিয় প্রাণীটি বেচিতেছে, বা সদ্যোমৃত জননীর

সৎকারের জন্য পুত্র ইন্ধনের অভাবে পড়িয়াছে, শিল্পসৃষ্টির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ; কিন্তু জনপ্রিয়তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দুঃখ-দুর্দশার ফাঁস আঁটিতে আঁটিতে লেখক পাঠকের প্রাণ কণ্ঠাগত এবং অশ্রু চক্ষুগত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার চেয়ে অনেক কম চাপে হতভাগ্য মহেশের মৃত্যু হইয়াছিল। অভাগীর স্বর্গেও অতিরঞ্জনের ছড়াছড়ি। অভাগী মরিয়াছে, শিল্পকলা মরিয়াছে, পাঠকেরও ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।[১৯]

মহেশ ও অভাগীর স্বর্গের সঙ্গে গল্পগুচ্ছের শাস্তি বা দুর্বুদ্ধি গল্প দুটির তুলনা করিলে সংযম ও অতিরঞ্জনে প্রভেদ বোঝা যাইবে। এ গল্প দুটির বিষয়ও দুঃখ-দারিদ্র্য এবং দুর্বলের উপরে প্রবলের অত্যাচার। ফাঁসির আসামী চন্দরা স্বামীর দর্শন-প্রার্থনাকে একটিমাত্র শব্দে নাকচ করিয়া দিয়াছে। চন্দরা বলিয়াছে 'মরণ!' শব্দ একটিমাত্র, কিন্তু জলমগ্নের অন্তিম নিশ্বাসের মতো সমস্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগ তাহাতে পুঞ্জিত। স্বল্পভাষী, অভিমানী, স্বামিগতপ্রাণ চন্দরার যোগ্য উত্তর। কিন্তু এই দৃশ্যটি শরৎচন্দ্রের হাতে পড়িলে কি অবস্থা ঘটিত ভাবিতেও অতঙ্কবোধ হয়। এই প্রভেদের মূলে আছে একজনের সংযম আর অপরের অতিরঞ্জন।

আর দুটি গল্প গ্রহণ করা যাক। শরৎচন্দ্রের বামুনের মেয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের সমস্যা-পূরণ। দুটির ঘটনা অননুরূপ নয়। কিন্তু আর বড় মিল নাই। শরৎচন্দ্র 'বামুনের মেয়ে' নামটিতেই Irony-র বা ব্যঙ্গের প্রবল ঘণ্টাধ্বনি করিয়া মেলার সার্কাসওয়ালার মতো দর্শককে নিজের তাঁবু-কানাতের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। আর গল্প সমাপ্ত

১৯ এমন যে হইয়াছে তাহার কারণ শরৎচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক। তথ্য বর্জন, সূক্ষ্ম রেখায় অঙ্কন তাঁহার ধর্ম নয়। উপন্যাসের তথ্যবাহুল্য ছোটগল্পের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া অনেক স্থলেই তিনি শিল্পকে অতিরঞ্জনের কোঠায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

হইবার আগে পর্যন্ত 'সমস্যা-পূরণ' নামটির দৃঢ়মুষ্টি হইতে আসল রহস্যটি কিছুতেই উদ্ধার করা যায় না। লেখকের নিজের উপরে বিশ্বাস আছে, বদ্ধমুষ্টি দেখিলে লোকে ফিরিয়া যাইবে বলিয়া তিনি ভয় পান নাই। আর শরৎচন্দ্র গোড়াতে টিকিটের পয়সা গুনিয়া লইয়া তবে পাঠককে তাঁবুতে ঢুকাইয়াছেন। পাঠককে যেখানে এমন ভয়, সেখানে অতিরঞ্জনই মনোরঞ্জনের প্রধান উপায়। তাই বামুনের মেয়ে গল্পটির পাতায় পাতায় 'শ্যামদেশের যমজ ভগ্নী,' 'ছিন্নকণ্ঠ কপোতের পুনর্জীবন লাভ' প্রভৃতির নায় অতিরঞ্জনের ছড়াছড়ি। একটিমাত্র গল্পে এমন প্রভূত অতিরঞ্জন কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘণ্টা বাজাইবার প্রয়োজন অনুভব করিলে রবীন্দ্রনাথ গল্পটির নাম 'যবনী-পুত্র' দিতে পারিতেন, আর তাহাতে আসর রীতিমতো জমিয়া উঠিত। সে প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই, গল্পটিকে তিনি সংযমের সবুজে ও বৈরাগ্যের ধূসরে আঁকিয়াছেন। আর পাছে ইহাতেও আভাসে অতিরঞ্জন আসিয়া পড়ে, তাই উপসংহারটিকে অতিশয় সুকুমার একটি ব্যঙ্গের তির্যক্-ছটায় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন।

সাত

এ পর্যন্ত দেখিলাম যে, লঘু তথ্য, সূক্ষ্ম রেখা এবং কোমল রঙের সাহায্যে কবি ছোটগল্পের নরনারীর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এইগুলিই উপাদানের সবটা নয়, আরও কিছু আছে। লঘু হাস্যরস, যাহাকে আমি অন্যত্র স্মিতহাস্যরস বলিয়াছি, আর একটি উপাদান। স্মিতহাস্যরস যেন হাসির নীহারিকা ; ক্ষীণভাবে, স্বচ্ছভাবে, আকাশে ছড়াইয়া আছে ; অনুভব করা যায়, কিন্তু স্পষ্টভাবে ধরাছোঁয়া যায় না ; মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় তাহা সংহত হইয়া নক্ষত্রের

দীপ্তি পাইয়াছে, আলঙ্কারিকেরা তাহাকেই বলিয়া থাকেন হাস্যরস। নীহারিয়া ও নক্ষত্রের মধ্যে যে প্রভেদ, ঠিক সেইরকম প্রভেদ হাস্যরসে ও স্মিতহাস্যরসে। নক্ষত্রপ্রভ হাস্যরস গল্পগুচ্ছে আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উপাদানরূপে কবি নীহারিকাসম স্মিতহাস্যরসকেই ব্যবহার করিয়াছেন। স্মিতহাস্যরসের প্রভাব সম্বন্ধে পাঠক সব সময়ে সচেতন হয় না, কিন্তু তাহার অগোচরে মনটি ভিজিয়া প্রসন্ন হইয়া ওঠে। যেভাবে গল্পটিকে গ্রহণ করা উচিত, কিংবা বর্ণিত নরনারীকে দর্শন করা উচিত, তাহার জন্য মনটা আপনাআপনি তৈয়ারী হইয়া থাকে। অলঙ্কারোক্ত হাস্যরস একসঙ্গে দেহ ও মনের হাসি, স্মিতহাস্যরস কেবল মনের হাসি। কেবল গল্পগুচ্ছে নয়, প্রায় সর্বশ্রেণীর রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ স্মিতহাস্যরসকে একটি উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, আর তাহার ফলে নিতান্ত দুরূহ বিষয়ও আশ্চর্য প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে। অনেক লেখক হাস্যরসকে কাপড়ের উপর বোনা ফুলের মতো ব্যবহার করেন, তাহা কাপড়ের অংশ হইলেও কতক পরিমাণে ভিন্ন, তাহাতে কাপড়খানা সুন্দর হইয়া ওঠে সত্য, কিন্তু ফুলটাকে বাদ দিলে কাপড়ের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পায় না। কিন্তু স্মিতহাস্য অন্য বস্তু। তাহার সূক্ষ্ম সূতা কাপড়ের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লম্বমান, এমন অনেক সূতা। সুতরাং তাহাকে বাদ দিলে বহুল পরিমাণে কাপড়ের অস্তিত্বটাই লোপ পায়। কাজেই স্মিতরসের সঙ্গে কাহিনীর বা পাত্রপাত্রীর অঙ্গাঙ্গী যোগ, এতটুকুও আকস্মিক নয়।

গল্পগুচ্ছে তিনভাবে স্মিতহাস্যরসের ব্যবহার করা হইয়াছে; সংলাপে, ঘটনা-বিন্যাসে ও চরিত্র-পরিকল্পনায়। এখানে চরিত্র-পরিকল্পনা-প্রসঙ্গে স্মিতহাস্যরসের আলোচনা করিব। আমার তো গল্পগুচ্ছের প্রধান নরনারী এমন একটিও চোখে পড়ে না, যাহার চরিত্রে স্মিতরসের কিছু মিশল ঘটে নাই; তবে সে পদার্থ কোথাও স্বচ্ছ কোথাও অনচ্ছ, কোথাও লঘু কোথাও ঘনীভূত।

তারাপ্রসন্ন, সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র, ভবানীচরণ, অনাথবন্ধু, নবেন্দুশেখর, মিস্টার নন্দী প্রভৃতি চরিত্রে এই রস অত্যন্ত ঘন ; বেশ বুঝিতে পারা যায়, আর একটু ঘনীভূত হইলেই তাহা নক্ষত্রের সংহতি লাভ করিয়া হাস্যরসে পরিণত হইতে পারিত।

কখনো কখনো স্মিতরসের কৌতুকচ্ছটা তির্যক্‌ভাবে প্রতিফলিত হইয়া চরিত্রগুলিতে শ্লেষের তীক্ষ্নতা দান করিয়াছে ; যজ্ঞনাথ কুণ্ড, দালিয়া, বৈদ্যনাথ (পুত্র-যজ্ঞ), প্রতিবেশিনী গল্পের নায়ক প্রভৃতি উদাহরণ।

আবার কখনো বা দুরদৃষ্টক্রমে স্মিতরস নিষ্ঠুতার কাছে পৌঁছিয়াছে। নষ্টনীড়ের ভূপতি ইহার দৃষ্টান্ত ; সে বেচারা যখন বিশ্রব্ধচিত্তে বিশ্বের হিতসাধনে ব্যস্ত ছিল, অদৃষ্ট তাহার গৃহসুখ লক্ষ্য করিয়া শ্লেষোজ্জ্বল শর-সন্ধান করিতেছিল এবং তাহাতে ভূপতির সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল ; শরটির নির্মাণ অদৃষ্টের হাতে, নিক্ষেপ ভূপতির হাতে।

প্রয়োজন হইলে স্মিতরস তিক্ত হইয়া উঠিতে পারে সত্য, কিন্তু মোটের উপরে তাহার স্বভাবটা স্নিগ্ধ। বালক যেমন নিজের উপরে প্রয়োগ করিয়া সদ্য-ক্রীত ছুরিখানার ধার পরীক্ষা করে, এমনভাবে পরীক্ষা করে, যাহাতে রক্তপাত না হয় অথচ কিঞ্চিৎ বেদনাবোধ হইতে থাকে, কর্তব্যের কঠোরতা ও সংযম-শাসনের মধ্যে আপসে পরীক্ষাকার্য সমাধা হয়, তেমনিভাবে অনেক নায়ক নিজের স্মিতহাস্য-রসের প্রয়োগ করিয়াছে ; উদাহরণ একরাত্রির নায়ক, ঠাকুরদা গল্পের "আমি", ডিটেকটিভ ও অধ্যাপক গল্পের নায়কদ্বয়, এবং প্রতিবেশিনী, দর্পহরণ, অপরিচিতা, হৈমন্তী, পয়লা নম্বর প্রভৃতি গল্পের নায়কগণ। গল্পগুলি সবই নায়ক-মুখে বিবৃত। কখনো কখনো এই স্মিত-হাসি ঈর্ষার উপরে প্রতিফলিত লইয়া মৃত্যুমুখী বাণের ফলার মতো ঝকমক করিয়া ওঠে। কঙ্কাল গল্পের নায়িকার নিজমুখে প্রদত্ত বিবরণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। চরিত্র-পরিকল্পনায় স্মিতরসের ব্যবহার যুক্ত করিয়া

লইলে গল্পগুচ্ছে স্মিতরসের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হইবে, বুঝিতে পারা যাইবে, গল্পগুচ্ছ পরিকল্পনার ইহা অন্যতম প্রধান উপাদান।

আট

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির বিষয়বস্তু কি এবং পাত্রপাত্রী কাহারা? অধিকাংশই অবজ্ঞাত জীবনের ছোটোখাটো সুখদুঃখ, অধিকাংশ নরনারীই সামান্য সাধারণ নরনারী। দালিয়া বা দুরাশার মতো দুচারটি গল্প ছাড়া কোথাও ইতিহাসের বৃহৎ অঙ্কপাতের চিহ্ন নাই, এমন কি ধনী ও অভিজাত নরনারীও বিরল। ইতিপূর্বে প্রসঙ্গান্তরে ছিন্নপত্রের যে-সব অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে গল্পগুলির বিষয়বস্তুর ও নরনারীর জীবনের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিষয়বস্তুর ও নরনারীর সামান্যতা সম্বন্ধে এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরঞ্চ কবিমনের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ উজ্জ্বল ও অর্থময় হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রকাব্যের দুটি আকাঙ্ক্ষার কথা কবি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন—একটি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, আর একটি সুখদুঃখপূর্ণ সংসারে অনুপ্রবেশের আকাঙ্ক্ষা। গল্পগুচ্ছে শেষ আকাঙ্ক্ষাটির অপূর্ব চরিতার্থতা, আবার সোনার তরী ও চিত্রার ন্যায় কাব্যে প্রথম আকাঙ্ক্ষাটির সফলতা—আর এই দুইয়ে মিলিয়া একটি বিচিত্র পূর্ণতা। একদিকে মানসসুন্দরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, জ্যোৎস্না-রাত্রে, উর্বশী, পূর্ণিমা, আবেদন, বিজয়িনীর ন্যায় কবিতা, আর একদিকে পোস্ট্‌মাস্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, সুভা, ছুটি, শাস্তি, খাতা, অনধিকার-প্রবেশ, দিদি, অতিথি প্রভৃতির ন্যায় গল্প। হঠাৎ দেখিলে এই দুই শ্রেণীর রচনাকে অসঙ্গত মনে হইতে পারে, কিন্তু

ইহাদের আপাতভেদ রবীন্দ্রকাব্যের পূর্বোক্ত আকাঙ্ক্ষাদ্বয়ের মধ্যে এক পরম সঙ্গতি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-কবিজীবনের এক কোটিতে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আর এক কোটিতে সুখ-দুঃখের সংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, ইহাদের এক কোটিতে সোনার তরী ও চিত্রার অধিকাংশ কবিতার অবস্থিতি আর এক কোটিতে গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পের অবস্থান। এইভাবে দেখিলে তবেই ইহাদের সম্পর্ক ও সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে।

পিতা যেমন অবোধ শিশুসন্তানের কার্যকলাপ দেখেন, স্মিত-হাস্যরসের দৃষ্টিতে কবি তেমনি পল্লী-নরনারীর জীবনলীলাকে দেখিয়াছেন, এবং সহিষ্ণু-স্নেহের সঙ্গে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে লেখক ও লিখিত নরনারীর জীবনের মধ্যে দুস্তর দূরত্ব কিন্তু কবির সমবেদনার দূরবীক্ষণী দৃষ্টি তাহাদের কাছে আনিয়া দিয়াছে, শিল্প যে দূরত্ব ও নৈকট্যের যুগপৎ অপেক্ষা রাখে এইভাবে তাহার সমাধান হইয়াছে। এমন সমবেদনার সমদৃষ্টি রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্যত্র বিরল। সোনার তরী কাব্যের শেষাংশে কতকগুলি চতুর্দশ-পদী আছে। সেগুলিতে সমবেদনা ও সহিষ্ণুতার অপূর্ব মিশ্রণ ও প্রকাশ।[৮০]

কবি মায়াবাদীকে বলিতেছেন—

"লক্ষ কোটি জীব লয়ে
এ বিশ্বের মেলা,
তুমি জানিতেছ মনে
সব ছেলেখেলা।"

তার পরে—

"হোক খেলা, এ খেলায়
যোগ দিতে হবে

৮০ মায়াবাদ, খেলা, বন্ধন, গতি, মুক্তি, ক্ষমা, দারিদ্র্য ও আত্মসমর্পণ।

আনন্দকল্লোলাকুল
নিখিলের সনে।...
কেমনে মানুষ হবে
না করিলে খেলা।"

পুনরায়—

"তেমনি সহজ তৃষ্ণা
আশা ভালোবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস
কত সুখে দুখে
করিতেছে আকর্ষণ"

কবি বুঝিয়াছেন—

"জানি আমি সুখে দুঃখে
হাসি ও ক্রন্দনে
পরিপূর্ণ এ জীবন"

পৃথিবীর সম্বন্ধে বলিতেছেন--গল্পগুচ্ছের পল্লী-ভূখণ্ডের প্রতিও সমানভাবে প্রযোজ্য—

"যেখানে এসেছি আমি,
আমি সেথাকার,
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।"

এই ধরিত্রী কেমন?

"তাই তোর মুখখানি বিষাদকোমল,
সকল সৌন্দর্যে তোর ভরা অশ্রুজল।"

আবার আছে—

"জন্মেছি যে মর্তকোলে,
ঘৃণা করি' তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর
মুক্তি খুঁজিবারে।"

তবে কবির কর্তব্য কি ?

"তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দু'একটি প্রীতিসুমধুর
অন্তরের ছন্দোগাথা ; দুঃখের ক্রন্দনে
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদবিধুর
তোমার কণ্ঠের সনে।"

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি সেই সাধারণীর, সামান্যার, অক্ষমার, দরিদ্রার 'প্রীতিসুমধুর' সুখের গান ও 'বিষাদবিধুর' দুঃখের ক্রন্দন। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি সমস্তই এই কবি-অভিলাষের গল্পময়ী টীকা।

তাহা হইলে দেখিলাম যে, গল্পগুলির বিষয়বস্তু জীবনের ছোট-খাটো সুখদুঃখ। এ সম্বন্ধে কবির একখানি পত্র উদ্ধার করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না—

"যতই একলা আপনমনে নদীর উপরে কিংবা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায়, ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ ক'রে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না। মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত তাই করছে, কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার জন্যে চেষ্টা করছে না বলেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য। অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু বড় সামান্য নয়, ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে তবে ঘাসরূপে টিঁকে থাকতে পারে, তার শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্যন্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়, সে যে নিজের শক্তি লঙ্ঘন ক'রে বটগাছ হবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে না এইজন্যই পৃথিবী এমন সুন্দর শ্যামল হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বা-চৌড়া কথার দ্বারা নয় কিন্তু প্রাত্যহিক ছোট ছোট কর্তব্য সমাধা দ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আসে। কবিত্বই বলো আর বীরত্বই বলো কোনোটাই আপনাতে

আপনি সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যের মধ্যেও তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে। ব'সে ব'সে হাঁসফাঁস করা, কল্পনা করা, কোনো অবস্থাতেই আপনার যোগ্য মনে না করা এবং ইতিমধ্যে সমুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া, এর চেয়ে হেয় আর কিছু হতে পারে না। যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায় নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্তব্য সত্যের সঙ্গে, বলের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে পালন করে যাবো, এবং যখন বিশ্বাস হয় হয়তো তা করতে পারবো, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ছোটখাটো দুঃখ বেদনা একেবারে দূর হয়ে যায়।"[৮১]

কবির এই আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প গল্পগুলিতে বর্ণিত নরনারীর জীবনে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আবার তাহাদেরই কাহারো কাহারো জীবনে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। একরাত্রি গল্পের সেকেণ্ড মাস্টার হঠাৎ মস্ত একটা বীরপুরুষ হইয়া উঠিবার আশায় যে ছোট সুখকে অবহেলা করিয়াছিল, একদিন সেই ছোট সুখই করুণ মুখে দুর্লভ পুষ্পমঞ্জরী হাতে করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুক্তির উপায়ের ফকিরচাঁদ জীবনের সুঃখদুঃখের সঙ্গে বনিবনাও করিতে না পারিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছে। সম্পাদক আপনার কন্যাকে অবহেলা করিয়া সম্পাদকীয় কর্তব্যে মনোনিবেশ করিয়া সার্থকতা-লাভ করিবে ভাবিয়াছিল। আর আমাদের অনাথবন্ধু (প্রায়শ্চিত্ত) "কোনো অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করার" ফলে নিজেকে ও নিজ পত্নীকে কী শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ফেলিয়াছিল। সম্পাদকীয় কীর্তিলোভে শোচনীয় পরিণামের আর একটি উদাহরণ নষ্টনীড়ের ভূপতি। আবার গুপ্তধনের লোভে সংসারের সহজলভ্য সুখকে অবহেলার অপর একটি দৃষ্টান্ত মৃত্যুঞ্জয়।

৮১ শিলাইদা, ১৬ই জুন, ১৮৯২, ছিন্নপত্র।

নয়

মোটের উপরে গল্পগুচ্ছের পুরুষচরিত্রগুলিতেই এই ভাবটি কিছু প্রবল। বোধ করি ইহা পুরুষচরিত্রের একটি লক্ষণ, হাঁসফাঁস করিয়া মরিবার, হস্তগতকে উপেক্ষা করিয়া অনায়ত্তের সাধনা করিবার, "কবিত্বের" ও "বীরত্বের" খ্যাতিকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়তো পৌরুষের সহিত অভিন্ন। সেইজন্যই বোধ করি বীর ও কবিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তাই বলিয়া নারীর নীরব বীরত্বও সামান্য নয়, তাহা চোখে পড়িতে চায় না বলিয়াই, খ্যাতির প্রত্যাশা করে না বলিয়াই হয়তো তাহার মূল্য বেশি। অনাথবন্ধুর পত্নী ও মাতা কী দুরবগাহ দারিদ্র্যের মধ্যে বীরোচিত ধৈর্য রক্ষা করিয়াছে। মহামায়া দগ্ধ মুখমণ্ডলের উপরে পূর্ণাবগুণ্ঠন টানিয়া সুখপ্রত্যাশাহীন গৃহকর্ম সমাপন করিয়া গিয়াছে আর সুরবালা দগ্ধ ললাটের উপরে অর্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া বৃদ্ধ পতির সেবা-সৌকর্য সাধন করিয়াছে। শাস্তি গল্পের চন্দরা, মেঘ ও রৌদ্রের গিরিবালা, নিশীথে গল্পের দক্ষিণাবাবুর প্রথম পক্ষের পত্নী, দিদি গল্পের দিদি সকলেই নীরব স্বকর্তব্যসাধনের সার্থক দৃষ্টান্তস্থল। ইহাদের মধ্যে চন্দরা, দিদি ও দক্ষিণাবাবুর প্রথম পক্ষের পত্নী তো এমন নীরবে আত্মবিসর্জন করিয়াছে যে, লোকখ্যাতি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। এই সঙ্গে আরও তিনটি নারীচরিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাসমণির ছেলের রাসমণি, শেষের রাত্রির যতীনের মাসি এবং তপস্বিনী ষোড়শী। রাসমণি কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বহুমুখী প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করিয়াছে, কী অনন্ত কৌশল ও স্নেহের সমস্যা যতনের মাসির, আর কী অপার নিষ্ঠা ষোড়শীর। এগুলি যদি বীরত্বের নিদর্শন না হয় তবে আর বীরত্ব কাহাকে বলে![৮২]

৮২ ছিন্নপত্র পত্র ৯৫

অবশ্য কোন কোন নারীচরিত্রে ইহার ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু জীবনেই যে ব্যতিক্রম আছে। স্বর্ণমৃগ গল্পে দেখি বৈদ্যনাথের স্ত্রী লোভের তাড়নায় স্বামীকে গুপ্তধন উদ্ধারের আশায় গৃহ-ছাড়া করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থকাম বৈদ্যনাথ সংসার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আর একটি ব্যতিক্রম নামঞ্জুর গল্পের অমিয়া এবং সংস্কার গল্পের কলিকা। ইহারা দু'জনেই রাজনৈতিক কর্মিণী। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের অর্থবোধ সহজ। রাজনীতি এমন একটি ক্ষেত্র যাহা মেয়েদের পক্ষে দীর্ঘকালের অভ্যাসের দ্বারা সহজ নয়, অন্তত আমাদের দেশের পক্ষে সহজ নয়। স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র হইতে নামিয়া মেয়েদের এখানে প্রবেশ করিতে হয়। যে-সহজ পূর্ণতার মধ্যে মেয়েরা স্বভাবতই প্রতিষ্ঠিত তাহা নষ্ট হইবার ফলে তাহাদের প্রকৃতিতে এই ব্যতিক্রমটি ঘটিয়াছে। খুব সম্ভব দীর্ঘকালের আচরণের দ্বারা তাহারা এই অপরিচিত ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে আবার এখানেই একটি সহজ সুষমা ও পূর্ণতা তাহারা লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু তার আগে একটা বিকৃতির অবস্থা অতিক্রমণ অপরিহার্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। সেখানেও নারীচরিত্রের ব্যতিক্রম অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রীর পত্রের মৃণাল ও পয়লা নম্বরের অনিলার চরিত্রদ্বয়ে কবি ইহার ক্রিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাদের ব্যবহারে ও সিদ্ধান্তে তাহাদের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধা জন্মে, কিন্তু সে শ্রদ্ধা রাসমণি বা যতীনের মাসির প্রতি যে-শ্রদ্ধা তাহা হইতে ভিন্ন। পূর্বোক্ত দু'জনের প্রতি মনুষ্যত্বের শ্রদ্ধা, শেষোক্ত দু'জনের প্রতি নারীত্বের শ্রদ্ধা। নারীর পক্ষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী আমাদের সমাজে নূতন, তাই মৃণালকে অনেক কথা ঝাঁজের সঙ্গে বলিতে হইয়াছে, বেশ সহজভাবে বলিতে পারে নাই। এখানে তাহারা অবশ্যই মহত্ত্বের পথ ধরিয়াছে, কিন্তু যে স্বাভাবিক পূর্ণতা দেখি রাসমণিতে ও যতীনের মাসিতে তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত। হয়তো কালক্রমে রাজনীতিক্ষেত্রের মতো ইহাও নারীর পক্ষে

স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে—তখন এখানেই তাহাদের চরিত্র এমন পূর্ণতা লাভ করিবে যাহা পুরুষের পক্ষে দুর্লভ।

এখন বুঝিতে পারা যাইবে, গল্পগুচ্ছের নারীচরিত্রগুলি কেন সমধিক উজ্জ্বল। ছোটখাটো কর্তব্য সমাধা এবং ছোটখাটো সুখ-দুঃখের চক্রাবর্তন পালনের দ্বারা তাহারা এমন একটি সম্পূর্ণতা ও সৌষম্য লাভ করিয়াছে যাহা পুরুষচরিত্রে একান্ত বিরল। পুরুষ-চরিত্রগুলি হয়তো বৃহত্তর কিন্তু নারীচরিত্রগুলি পূর্ণতর। বহুধাতুর ও বহুভাবের সমাবেশে পুরুষচরিত্রগুলি জটিল, নারীচরিত্র সে তুলনায় সরল। এই সরলতাও পূর্ণতার একটি কারণ। কারণ যাহাই হোক, গল্পগুলির নারীচরিত্র পুরুষচরিত্রের চেয়ে অধিকতর উজ্জ্বল ও সার্থক ইহাতে বোধ করি মতদ্বৈধ নাই।

আর উজ্জ্বল ও সার্থক গল্পগুচ্ছের বালকবালিকা-চরিত্রগুলি। রতন, মিনি, ফটিক, সুভা, মৃন্ময়ী, উমা, গিরিবালা, নীলকান্ত, তারাপদ, শুভদৃষ্টি গল্পের বোবা মেয়েটি, কালীপদ, সুবোধ, বলাই, গোবিন্দ প্রভৃতি বালক-বালিকা চরিত্র যেমন উজ্জ্বল, তেমনি সার্থক। ইহার একটি কারণ, নারীর মতো বালকবালিকাগণও সহজ, স্বাভাবিক অথচ সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে, এখানে পূর্ণতালাভ কঠিন নয়। কিন্তু কোন কারণে তাহারা সেই পরিবেশচ্যুত হইলে প্রাণের ভাণ্ডার হইতে ছিন্ন হইয়া মারা পড়ে; দৃষ্টান্ত, সুভা ও ফটিক। আবার উমা ও গিরিবালা অন্য একরূপ বিড়ম্বনার দৃষ্টান্ত। গিরিরালা-চারত্র অঙ্কন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, মানব-স্বভাবের সঙ্গে প্রকৃতির রঙ, রস ও স্নেহ মিশাইয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এ কথা তাঁহার অধিকাংশ বালকবালিকা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সুভা, ফটিক, রতন, মৃন্ময়ী বা বলাই কাহাকেও আমরা স্নেহময়ী প্রকৃতির পটভূমি ছাড়া ভাবিতেই পারি না। বালক-বালিকারা সহজেই প্রকৃতির কাছে রহিয়াছে।[৮৩]

৮৩ আগে একবার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রক্বাততত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছি।

দশ

স্মিতহাস্যরস যেমন গল্পগুচ্ছের নরনারীরূপ চরিত্রবসনে একটি তন্তু, তেমনি আর একটি তন্তু প্রকৃতি। স্মিতহাস্যরসের মতো এ বিষয়টিও সর্বত্র অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া যায় না। মৃন্ময়ী, সুভা, গিরিবালা বা বলাইয়ের ক্ষেত্রে প্রভাবটা স্পষ্ট, কিন্তু অন্যত্র তেমন নির্দেশযোগ্য নয় সত্য কিন্তু সমবেদনশীল পাঠকমাত্রেরই পক্ষে তাহা অনুমানযোগ্য। মোট কথা এই যে, প্রকৃতির রঙ, রস, রূপ, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও সঙ্কেত, অদৃশ্য অথচ অনুমানগম্য স্নেহপ্রভাব এই গল্পগুলির অন্যতম প্রধান উপাদান।

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষের অহম্মন্যতারূপ প্রবৃত্তিকে কবি মনুষ্যত্বলাভের সবচেয়ে কঠিন বাধা মনে করেন।[৮৪] অহম্মন্যতার ফলে মানুষের শ্রেয়োলাভের পথ বন্ধ হয়, অপরের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিকৃত হয় এবং বিশ্বের মধ্যে তাহার যে সহজ ও স্বভাবসংগত স্থান আছে সেখান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে মানসিক ও আত্মিক একঘরে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। লোভের পথে, ক্রোধের পথে, কামজ প্রবৃত্তির পথে, বংশমর্যাদা রক্ষার পথে অহম্মন্যতা প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। আবার যে ব্যক্তি অহম্মন্যতার দুর্গে আবদ্ধ আছে, কখনো কখনো আকস্মিক আঘাতে সে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া মুক্ত উদার আকাশের তলে পৌঁছিয়া আপনার স্বরূপটি

রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁহার অঙ্কিত বালক-বালিকাগণকে প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত করিয়া আঁকিয়াছেন, তাহাতে আবার ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রকৃতিতত্ত্বের কথা মনে আনিয়া দেয়। এই সূত্রে তাঁহার Lucy ও অন্যান্য অনেক বালক-বালিকা গিরিবালা, ফটিক, সুভা, মৃন্ময়ী প্রভৃতির সহোদর-সহোদরা। মিলটা কতখানি আকস্মিক, কতখানি আন্তরিক ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য।

৮৪ অহম্মন্যতা শব্দটি ব্যাকরণ হিসাবে সিদ্ধ নয়। পণ্ডিতম্মন্যতা হয়, কিন্তু অহম্মন্যতা হয় না। নাই হোক, কিন্তু শব্দটিতে আমার বড় প্রয়োজন।

বুঝিতে পারে। মিনির পিতা শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশের ফলে অহম্মন্যতার দুর্গে বাস করিতেছিল, হঠাৎ রহমতের কন্যাবাৎসল্য সেই দুর্গের প্রাচীর ফাটাইয়া দিতেই সে এমন একটি উদার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল যেখানে 'সেও পিতা, আমিও পিতা' এই সত্যটি বোঝা শক্ত নয়। আর্ত শূকরশাবকের মৃত্যুভয় জয়কালীর ভ্রান্ত শুচিতা-বোধকে মুহূর্তে বিদীর্ণ করিয়া দিল, অহম্মন্যতার কবল হইতে সে রক্ষা পাইল বলিয়াই অপবিত্র পশুটিকে দেবমন্দিরে স্থান দিতে পারিয়াছিল। আবার নয়ানজোড়ের কৈলাসচন্দ্র এবং শানিয়াড়ির ভবানীচরণ ভ্রান্ত বংশমর্যাদাবোধের দ্বারা আপনাদের মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এমন সময়ে ঘটনাচক্র আসিয়া সেই মোহচ্ছেদ করিল ; ভাবী নাতজামাইয়ের নতিস্বীকার এবং কালীপদর মৃত্যু সেই ঘটনাচক্র। ভ্রান্ত বংশমর্যাদাবোধ অহম্মন্যতার একটি প্রধান কারণ ; গুপ্তধন, পণরক্ষা, হালদারগোষ্ঠী, ভাইফোঁটা, ত্যাগ প্রভৃতি গল্প তাহার আরও দৃষ্টান্ত। সমস্যাপূরণ গল্পের কৃষ্ণগোপাল এতদিন যে সত্যগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহার কারণ অহম্মন্যতাই বাধাস্বরূপ ছিল। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, স্বর্ণমৃগ, সম্পত্তিসমর্পণ প্রভৃতি গল্প লোভজ অহম্মন্যতার উদাহরণ। আবার কামজ অহম্মন্যতার উদাহরণ হইতেছে মধ্যবর্তিনী, নিশীথে, উদ্ধার ও বিচারক প্রভৃতি গল্প। ফল কথা দেখা যাইবে যে, অহম্মন্যতাই নানা রূপে এবং নানা নামে মনুষ্যত্বের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। অধিকাংশ মানুষই সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সারা জীবন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কখনো কখনো কাহারো কাহারো *জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে যাহাতে সেই গণ্ডীপাশ ছিন্ন হইয়া

*এক্ষেত্রে অহঙ্কার বা আত্মম্ভরিতা বলিলেও চলিত যদি না বহু প্রয়োগে তাহাদের অর্থের ব্যাপকতা ও শিথিলতা ঘটিয়া যাইত। অহম্মন্যতার অর্থ করিতেছি মানুষের অহং যেখানে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়া তাহার শ্রেয়োলাভের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়।

যায়, তাহারা মুক্তি পাইয়া মনুষ্যত্বের রাজপথের উপরে আসিয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান যে, মানুষ যখন নিজেকে একান্ত-ভাবে দেখে তখনই অহম্মন্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। কিন্তু মানুষ যদি চরাচরের মধ্যে এবং মানবসমাজের মধ্যে আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেখে তবে এই আপদের কবলে আর পড়ে না, সে বাঁচিয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন—"এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি, চারদিকে এমন-সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি ক'রে কাল মেরামত ক'রে পরশু দিন বিক্রি ক'রে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিদিন সমানভাবে যাতায়াত করছে এবং চিরকাল অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষ ভাবে দেখি নে।"[৮৫]

কবির মতে এই বিশ্ববোধের ভাবটির উপলব্ধি সহজ, আবার তাঁহার মনের সহজ প্রবণতাও বিশ্ববোধ-উপলব্ধির প্রতি। এখন খুব সম্ভব এই দু'য়ে মিলিয়া—পরিবেশের অনুকূলতা এবং মানসিক অনুকূলতা—গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে এমন একটি স্বাভাবিক পূর্ণতা দান করিয়াছে যাহা রবীন্দ্র-গদ্যসাহিত্যের অন্যত্র সর্বদা সহজলভ্য নয়। কি চরিত্র-চিত্রণে, কি ঘটনা-বিন্যাসে, কি মানুষে প্রকৃতির টানা-পোড়েনে কাব্যবয়নে এই সহজ পূর্ণতার ভাবটি লক্ষ্য করিবার মতো এবং তাহার কারণটিও অনুধাবনযোগ্য।

৮৫ শিলাইদহ, অক্টোবর, ১৮৯১, ছিন্নপত্র। এই প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রের আরও কয়েকখানি পত্র দ্রষ্টব্য ৫৩, ৫৪, ১০৮, ১১০, ১১৫।

এগারো

এবারে গল্পগুলির প্লট বা কাহিনীবিন্যাস সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। দেখা যায় যে, কাহিনীবিন্যাস ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সাধারণত তিনটি পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন গল্প গীতিকবিতার প্যাটার্নে বা ছাঁচে গঠিত।[৮৬] একটি ভাব বা একটি অনুভূতিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ লেখক দিয়াছেন, ঘটনার গুরুত্ব ও নর-নারীর সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমাইয়া দিয়াছেন পাছে সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবটি নষ্ট হইয়া যায়। পোস্টমাস্টার, একরাত্রি, সুভা, শুভদৃষ্টি, খাতা, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্প।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পে কাহিনীবিন্যাসের কৌশল প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, লেখক এখানে আবেগের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া স্রোতোমুখে ভাসিয়া চলেন নাই, আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া ঘটনাস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সচেতন শিল্পবুদ্ধির দ্বারা কাহিনীটিকে সাজাইয়া লইয়াছেন। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, দালিয়া, দান-প্রতিদান, সমস্যা-পূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, অধ্যাপক, দৃষ্টিদান, কর্মফল ও নষ্টনীড় প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

অধিকাংশ তৃতীয় শ্রেণীর গল্প শেষজীবনে লিখিত, তাহাদের সাধারণ লক্ষণ অনেকটা সূত্র ও তাহার টীকাভাষ্যের অনুরূপ। একটা উদাহরণ দিতেছি—"এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমে গোল বাধিবার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে, কিন্তু তবু গোল বাধিল।" ইহাই

৮৬ ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, গল্পগুলিকে গীতিধর্মী বা লিরিক বলিতেছি। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব।

যেন গল্পটির সাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়—সমস্ত গল্পটি যেন এই সূত্রটির টীকা ও ভাষ্য? স্বভাবতই এমন গল্পে তত্ত্ব প্রাধান্যলাভ করে, আর বেশি-বয়সে তত্ত্বটাকে যে প্রাধান্য দিতে ইচ্ছা করে, সেটা বেশিবয়সের ধর্ম। শেষ বয়সে লিখিত হালদারগোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, বোষ্টমী, অপরিচিতা, পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী, নামঞ্জুর গল্প, সংস্কার, বলাই, চোরাই ধন প্রভৃতি গল্প সূত্র ও সূত্রের ব্যাখ্যামূলক।[৮৭] অবশ্য সব ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু পূর্বোক্ত তিনটি পন্থাকে সাধারণ নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না।

পোস্টমাস্টার, একরাত্রি বা সুভা গল্পগুলিকে প্রথম পন্থার দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করা যায় বলিয়াছি। অবান্তর ভার ও ঘটনার অবান্তর শাখা-প্রশাখা না থাকায় গল্পগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি সুগীত সঙ্গীতের মতো ধ্বনিত হইয়াছে। পোস্টমাস্টার গল্পটিতে একটি দ্বিধার ভাব আছে, রতন ও পোস্টমাস্টার দু'জনের দুঃখ বর্ণনার ফলে গল্পটির মধ্যে একটি ফাটলের রেখা দেখা দিয়াছে। কিন্তু একরাত্রি বা সুভায় সে দ্বিধা নাই, একরাত্রির নায়কের এবং সুভার দুঃখবর্ণনাতেই গল্পের আরম্ভ ও শেষ—ঐ দুঃখবর্ণনার ছলেই কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্যান্য গল্পগুলিও অল্পবিস্তর এক রীতিই অনুসরণ করিয়াছে।

কাহিনীবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের তেমন মনোযোগ কখনো ছিল না। উপন্যাস বা নাটকের ক্ষেত্রেই এই মনোযোগের অভাব সবচেয়ে বেশি গোচর হয়। কিন্তু কাহিনীবিন্যাস-সমৃদ্ধ ছোটগল্পগুলিতে তিনি আশ্চর্য সফলতা লাভ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর আদর্শ রূপে খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, নষ্টনীড় বা কর্মফলকে গ্রহণ করা যাইতে

৮৭ কেবল শেষ বয়সের ছোটগল্পগুলি নয়, দুই বোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায় প্রভৃতি খণ্ড-উপন্যাসও একই প্যাটার্নে গঠিত।

পারে। তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ গল্পই শেষ বয়সে লিখিত। আত্মব্যাখ্যা ও তত্ত্বব্যাখ্যার ইচ্ছায় ইহাদের জন্ম। ইহা কবির শেষবয়সের উপন্যাস ও নাটক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কিন্তু নাটকে ও উপন্যাসে যাহা আতিশয্যে পরিণত হইয়া অনেক সময়ে রসহানি ঘটাইয়াছে, ছোটগল্পের ক্ষেত্র স্বল্পায়ত বলিয়া তত্ত্বব্যাখ্যা ও আত্ম-ব্যাখ্যার প্রবৃত্তি তেমন বিড়ম্বনা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কি পদ্যে, কি গদ্যে স্বল্পায়ত ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতে রবীন্দ্রনাথের দোসর নাই।

বারো

এখানে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের গীতিধর্মী অপবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। অনেকে তাঁহার গল্পগুলিকে গীতিধর্মী বলিয়া সংক্ষেপে কাজ সারিয়াছেন, আবার অনেকে কাব্যধর্মী বলিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই পরিষ্কার করিয়া লওয়া দরকার যে, গীতিধর্ম বা কাব্যধর্ম এক বস্তু নয়। কাব্যধর্ম্ম কাব্যের সাধারণ গুণ, গীতিধর্ম বিশেষ এক শ্রেণীর কাব্যের গুণ; এ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। কাব্যধর্ম কাব্যমাত্রেই বর্তমান বলিয়া গীতিকাব্যেও বর্তমান, কিন্তু গীতিধর্ম সব কাব্যে থাকে না, কেবল গীতিকাব্যেই থাকে। এখন যদি বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কাব্যধর্মী, তাহাতে একপ্রকার সত্য বোঝায়, আর ওগুলিকে লিরিক-ধর্মী বলিলে তাহাতে আর একপ্রকার সত্য বোঝায়।

সত্যই রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর রচনার ন্যায় তাঁহার ছোটগল্পগুলিও কাব্যধর্মী। কাব্যের বিশেষ গুণ বলিতে যাহা বুঝি—যেমন কল্পনার প্রাচুর্য, অলঙ্কারবহুলতা প্রভৃতি—তাঁহার অন্যান্য শ্রেণীর রচনার মতো ছোটগল্পে অবশ্যই আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের

কপালকুণ্ডলা কাব্যধর্মী, ভিক্টর হুগোর Toilers of the Sea কাব্যধর্মী ; কাব্যধর্ম ভাবাত্মক রচনার পক্ষে সব সময়ে দোষ নয়। কাজেই কাব্যধর্ম রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পক্ষে দোষ নয় ; তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, ইহা তাঁহার ছোটগল্পে একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে যাহা অন্যান্য লেখকের ছোটগল্পে দুর্লভ।

কিন্তু গীতিধর্মী অপবাদ এত সহজে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না, কারণ গল্পের পক্ষে গীতিধর্ম সব সময়ে গুণ নহে।

গীতিধর্ম কি ? গীতিকবিতা বা লিরিক স্বল্পায়ত রচনা, কিন্তু আয়তনের সঙ্কীর্ণতা কি লিরিকের অপরিহার্যতম লক্ষণ ? খুব সম্ভব, নয়। হোক বা না হোক, উহার উপরে তেমন গুরুত্ব দেওয়া যায় না। এখন ছোটগল্প আকারে সাধারণত স্বল্পায়ত হয় বলিয়াই কি তাহা লিরিক বা গীতিকাব্যের সগোত্র ? আগেই বলিয়াছি রচনার আয়তন অবশ্যই একটা লক্ষণ কিন্তু তাহার উপরে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

লিরিক বা গীতিকবিতার অপরিহার্যতম গুণ হইতেছে রচনার উপরে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ। অন্য শ্রেণীর রচনাতেও লেখকের ব্যক্তিত্ব ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু রচনার পক্ষে তাহা অবশ্যম্ভাবী নয়, বরঞ্চ অনেক সময়েই দোষের কারণ। কিন্তু গীতিকাব্যে উহা অত্যাবশ্যক মাত্র নয়, উহাই গীতিকাব্যের প্রাণ। অন্যান্য শ্রেণীর কাব্যের প্রাণদান করিয়া থাকেন লেখক, কিন্তু গীতিকাব্যের মধ্যে তিনি নিজেই যেন ঢুকিয়া প্রাণস্বরূপ বিরাজ করেন। গীতিকাব্যের কবি সমস্ত জগৎকে আত্মপ্রক্ষেপের দ্বারা আবিষ্ট করিয়া দেখেন, সমস্তই তাঁহার পক্ষে মন্ময়, এখানে সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক। ইহাই গীতিকবিতার অপরিহার্যতম গুণ।

এখন, কোন রচনায় লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ থাকিলে তাহাকে গীতিধর্মগুণসমন্বিত বলা চলে। কিন্তু রচনার ভাবোচ্ছ্বাস মাত্রই গীতিধর্ম নয়, সে ভাবোচ্ছ্বাস লেখকের ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস হওয়া

দরকার। শেক্সপীয়রের নাটকে অনেক স্থলে ভাবোচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু তাহা পাত্রপাত্রীর চরিত্রকে লঙ্ঘন করিয়া যায় নাই বলিয়া লিরিক ভাবোচ্ছ্বাস নয়। পাত্রপাত্রীর চরিত্রের সীমানার মধ্যে উত্থিত ভাবোচ্ছ্বাস কাব্যধর্মী হইতে পারে, কিন্তু কখনো গীতিধর্মী নয়।

গল্পগুচ্ছের ছোটগল্পে অনেক স্থলেই ভাবোচ্ছ্বাস আছে। একটি উদাহরণ লইতেছি। জয়-পরাজয় গল্পে পরাজিত শেখরকবির মৃত্যুপূর্ব উক্তি একটি মনোরম ভাবোচ্ছ্বাস, অনেকেই ইহাকে গীতিধর্মী বলিবেন। কিন্তু বিচার্য বিষয়, এই ভাবোচ্ছ্বাস কি শেখরকবির চরিত্রকে লঙ্ঘন করিয়া ধ্বনিত হইয়াছে? আমার তো সেরূপ মনে হয় না। কিন্তু ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কেন না, লেখক নিজেও কবি, এক বয়সে তাঁহাকেও শেখরকবির ন্যায় অযোগ্যের হাতে অবহেলা সহ্য করিতে হইয়াছে। এখন অবস্থাসাম্যে শেখরকবির খেদকে লেখকের খেদ বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঐ খেদোক্তি শেখরচরিত্র হইতেই ধ্বনিত হইয়াছে, লেখকের কণ্ঠ হইতে নয়।

স্বয়ং কবি কঙ্কাল ও ক্ষুধিত পাষাণকে গীতিধর্মী বলিয়াছেন।[৮৮] কিন্তু আমার সেরূপ মনে হয় না। কঙ্কালের কাহিনী স্বপ্নদৃষ্ট, দ্রষ্টাকে লেখক বলিয়া ধরিলেও কাহিনীর সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্বকে অভিন্ন মনে করা যায় না। ঐ কাহিনী স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষে objective বা জগদাত্মক। জীবদেহে সঞ্চরমাণ বীজাণু যেমন দেহ হইতে ভিন্ন, ইহাও অনেকটা তেমনি। ক্ষুধিত পাষাণ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ঐ যে অদ্ভুত লোকটি, অজ্ঞাতনাম স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে কয়েকটি মাত্র ঘণ্টার জন্য যাহার সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা, তাহার মুখে কাহিনীটি একটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। গল্পগুচ্ছের আর এমন কোন

৮৮ রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় পৃ৫৬৮

পুরুষচরিত্র মনে পড়িতেছে না, যাহার মুখে কাহিনীটি বেখাপ না শোনাইত। কল্পনাপ্রধান বলিয়াই কাহিনীটিকে গীতিধর্মী বলিব কেন? লেখকের ব্যক্তিত্বের সহিত সঙ্গতি থাকিলে বলিতে পারিতাম, কিন্তু তেমন কোন সঙ্গতি তো চোখে পড়ে না।

দুরাশা গল্পের নায়িকা বদ্রাওনের নবাবকন্যার মুখে অনেক ভাবোচ্ছ্বাস আছে। কিন্তু সে কি চরিত্রের সম্ভাবনাকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে? স্ত্রীর পত্র গল্পে মৃণালের পত্র সমস্তটাই একটা সুদীর্ঘ ভাবোচ্ছ্বাস, কিন্তু তাহার বীজ কি মৃণালচরিত্রের মধ্যে নিহিত নয়?

আসল কথা, গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পে গীতিধর্ম বিদ্যমান, কিন্তু যত বেশি মনে করা হয় তত নয় এবং যেগুলিকে সাধারণত তাহার উদাহরণ মনে করা হইয়া থাকে সেগুলিও নয়।

গীতিধর্মের আতিশয্যের ফলে যেখানে চরিত্রের কার্যকলাপ আপন সীমানাকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে, তেমন দু'একটি উদাহরণ দিতেছি। অধ্যাপক গল্পটি। ঐ গল্পের নায়ক নিষ্ফল কবিযশঃপ্রার্থী বলিয়া লেখক কর্তৃক বর্ণিত। কিন্তু তেমন করিয়া তাহা বিশ্বাস করি? উক্ত কবিযশঃপ্রার্থী যে-ভাষাতে এবং সূক্ষ্ম সুকুমার কবিত্বঘন যে-ভাবের পথে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কল্পনার যে-অভাবিত প্রাচুর্য তাহার উক্তির বাঁকে বাঁকে, মানুষের মনের অন্ধিসন্ধির যে-পরিচয় তাহার উক্তির ছত্রে ছত্রে, শুধু তাই নয়, নিজের প্রতি ব্যঙ্গ করিবার যে-দুঃসাহস তাহার পক্ষে সুলভ, এসব কি ব্যর্থ কবিযশঃপ্রার্থীর লক্ষণ? কাহারো ভুল করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই ঐ লোকটি বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক। আর কিছুই নয়, লেখকের নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ঐ লোকটির ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। গল্পটি নায়ক-কর্তৃক কথিত না হইয়া লেখক-কর্তৃক কথিত হইলে এই ভ্রান্তি ঘটিত না। যে-বর্ণনা, যে-ভাষা, যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের মুখে বিশ্বাসযোগ্য হইত, ব্যর্থ কবিযশঃপ্রার্থীর মুখে তাহাই অবিশ্বাস্য হইয়া উঠিয়াছে। লেখক কখন যে ঐ লোকটির মধ্যে আত্মপ্রক্ষেপ

করিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই অবগত নন। গীতিধর্মের আতিশয্যই এই বিড়ম্বনার কারণ।

আর একটি উদাহরণ মণিহারা গল্পটি। মণিমালিকার বিয়োগান্ত জীবনকাহিনী একজন জীর্ণ শিক্ষকের দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। উক্ত শিক্ষক যে অপরূপ বিচক্ষণতার সহিত স্ত্রীপুরুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছে তাহা একান্ত দুর্লভ, এবং তাহার জন্য, অর্থাৎ তাহার মুখে এইসব কথা শুনিবার জন্য, লেখক পাঠককে প্রস্তুত করিয়া লন নাই। আমার মনে হয়, এখানেও উক্তি ও জ্ঞান চরিত্রের সীমানাকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। উক্ত শিক্ষককে দেখিয়া গল্পের নায়কের মনে কোলরীজের বুড়া নাবিকের কথা জাগিয়াছে। কিন্তু কোলরীজের নাবিক একটি শব্দের দ্বারাও নিজের সম্ভাবনাকে লঙ্ঘন করিয়া যায় নাই। আমার বিশ্বাস, এখানেও কবির আত্মপ্রক্ষেপ এই বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে।

মোটের উপরে, এই রকম দু'চারটি ক্ষেত্র ব্যতীত, লিরিক বা গীতিধর্মের আতিশয্য হেতু শিল্পস্খলনের দৃষ্টান্ত আমার তো চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রপ্রতিভা মূলত গীতিধর্মী বলিয়া কোন কোন সমালোচক গল্পগুচ্ছ সম্বন্ধে গীতিধর্মের টানা অভিযোগ আনিয়া থাকিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

তেরো

গল্পগুচ্ছে অন্য শ্রেণীর দোষ যে কিছু কিছু না আছে তা নয়। কিন্তু গল্পের সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিলে, সে-সব দোষ নগণ্য বলিয়া মনে হইবে।

বিরাট রবীন্দ্রসাহিত্যের সমগ্র পাঠ করিয়াছি এমন বলিতে পারি না, কিন্তু এক রকম কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রসাহিত্যে

এমন একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য আছে যাহা সমশ্রেণীর সাহিত্যিকের রচনায় বিরল। গ্রাম্যতা দোষ, প্রাদেশিকতা দোষ, আতিশয্য দোষ প্রভৃতি নাই বলিলেই হয়। বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে-মন এই সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, কল্পনার উচ্চাকাশে তাহা একটি দিব্য গরুড়ের মতো আপনাতে আপনি বিধৃত হইয়া অচঞ্চলভাবে বিরাজমান। সাহিত্যের রূপ হইতে মনের স্বরূপবোধ যদি সম্ভব হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, এমন সহজ সংস্কারমুক্ত মন সাহিত্যজগতে বিরল। সেই একই মনের সৃষ্টি তো গল্পগুচ্ছ। তাই ইহার গল্পগুলিতে সহজ স্বচ্ছতা, জড়ত্বহীনতা এবং সংস্কারমুক্তির ভাব বর্তমান।

(গল্পগুচ্ছে করুণ রস যথেষ্ট আছে, কিন্তু করুণ রস কদাচিৎ অতি-করুণতায় বা ভাবালুতায় পরিণত হইয়াছে। মাস্টার মশাই, পণরক্ষা, কর্মফল বা পুত্রযজ্ঞ প্রভৃতি গল্পের উপসংহার কতক পরিমাণে ভাবালুতা দোষ-যুক্ত (Sentimental) বলিয়া আমার মনে হয়। যদি অপর কাহারো সেরূপ মনে না হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, উহা আমারই দৃষ্টিবিভ্রম।

আর কতকগুলি গল্প আছে, যেমন, সদর ও অন্দর, উদ্ধার, দুর্বুদ্ধি, ফেল, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ প্রভৃতি—এগুলি যেন লেখকের অমনোযোগের সৃষ্টি। অকালে গর্ভবাসচ্যুত সন্তানের মতো ইহারা রুগ্‌ণ, যথেষ্ট পরিমাণে রক্তমাংসে গঠিত নয়। এরূপ হইবার কারণ রবীন্দ্রজীবনীতে বিবৃত হইয়াছে।[৮৯] এক সময়ে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে শিলাইদহে কিছুদিন ছিলেন। তখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি করিয়া নূতন গল্প তাঁহাকে শোনাইতে হইত, এই গল্পগুলি সেই দৈনিক দাবির মুখে লিখিত বলিয়াই এমন রক্তাল্পতা-দোষদুষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাস। আমার মনে হয় তাঁহার বিশ্বাস অমূলক নয়।

৮৯ রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, পৃ ৩৬৯।

উদ্ধার গল্পটি সম্বন্ধে সাহিত্য, (পৃ ৬১৯, ভাদ্র ১৩০৭) যে মন্তব্য করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।[১০] "রবীন্দ্রবাবুর 'গৌরী' অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতাই বটে, তাহার চকিত দীপ্তি নিমেষের জন্য চক্ষের উপর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার সমস্তটা কখনই কল্পনার কারায় ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। গল্পটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, গল্পের কঙ্কাল বলিলেও চলে। এই পঞ্জরপিঞ্জরে তিনটি প্রাণী··। অতি ক্ষুদ্র গল্পের সঙ্কীর্ণ পরিসরে তিনজনের স্থান পর্যাপ্ত নয়। কবি কেবল রেখায় গল্পটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আখ্যানবস্তুর একটা অস্পষ্ট আভাসমাত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে। ছায়ালোক-সম্পাতে আর একটু পরিণত হইলে গল্পটি সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত।"

এই মন্তব্য উদ্ধার গল্প সম্বন্ধে কেবল সত্য নয়, ঐ সঙ্গে উল্লিখিত সব কয়টি গল্প সম্বন্ধে সত্য। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই নিষ্ঠাবান্ শিল্পী, কিন্তু কখনো কখনো ঘটনাচক্রজাত অমনোযোগের ফলে নিষ্ঠার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, গল্প কয়টি তাহারই উদাহরণ।

মেঘ ও রৌদ্রের উপসংহার আমার কাছে অসন্তোষজনক মনে হয়, যেন ভাবালুতার কুয়াশায় ঝাপসা। গল্পটির সূচনা লিরিক বা গীতির প্যাটার্নে; কিন্তু তার পরেই উহা কাহিনীবিন্যাসচাতুর্যকে অনুসরণ করিয়াছে; শেষ পর্যন্ত এ দুই রীতির মধ্যে একটা সমন্বয় করিতে পারিলে হয়তো ভালোই হইত; কিন্তু তাহা সম্ভব না হওয়ায় উপসংহারে আবার গীতির প্যাটার্নে ফিরিয়া আসবার নিষ্ফল চেষ্টায় রসহানি—এক্ষেত্রে ভাবালুতা দোষ—ঘটিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা।

তবে যখন স্মরণ করি যে, গল্পসংখ্যা চুরাশি, বৈচিত্র্য ততোধিক, দোষগুণসমন্বিত বাংলার পল্লীজীবনের ইহা এক বিচিত্র পুরাণস্বরূপ, তখন এই সামান্য দোষগুলিকে চন্দ্রের কলঙ্কের মতো চন্দ্রের গুণের পরিবর্ধক বলিয়াই মনে হয়।

১০ রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, পৃ ৩৬৯।

সে

সে ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।[৯১]

'সে' কেবল ছোটগল্পের সমষ্টি নয়, বিশেষভাবে ছোট ছেলে-মেয়েদেব জন্য লিখিতও বটে। তৎসত্ত্বেও ইহাতে বয়স্কদের উপভোগের সামগ্রী যথেষ্ট আছে এমন কি বয়স্কদের উভভোগেব সামগ্রীই যেন অধিক। ইহার গল্পগুলির সমগ্র ও যথার্থ রস অল্পবয়স্কদের গ্রাহ্য কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

কিন্তু ইহাকে ছোটগল্পের সমষ্টি মনে না করিলেও চলে, ইহার অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা বর্তমান। কাহিনীর ধারাবাহিকতা নয়, নায়ক-নায়িকার ধারাবাহিকতা। 'সে' গ্রন্থের প্রধান নায়ক-নায়িকা তিনজন আমি (গল্পকথক), তুমি (গল্পের শ্রোতা অর্থাৎ পুপুদিদি) আর সে। এ তিনজন ছাড়াও আরো লোক আছে, তবে তাহারা গৌণ, কেবল শেষাঞ্চলের সুকুমারের কিছু গৌরব আছে।

'সে' গ্রন্থটি কিম্ভুত-রসাশ্রিত একটি কাহিনীর ধারা। 'সে' মানুষটি কিম্ভুত-রসাশ্রিত একটি ব্যক্তি। তাহার চরিত্রের কিম্ভুতরসের

---

৯১ "নবপর্যায় সন্দেশ পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের আশ্বিনে, কার্তিকে এবং অগ্রহায়ণে এই গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের কোন কোন অংশের পূর্বতন পাঠ প্রকাশিত হয়। রংমশাল পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৪৩ কার্তিক,পৃ ১-৬) যাহা মুদ্রিত হয় প্রায় তাহাই 'সে গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সঙ্কলিত হইয়াছে ; ভূমিকাংশটি (রংমশালের পাঠ) 'সে' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ঈষৎ রূপান্তরিতভাবে গ্রথিত আছে। ২২৮-২৯ পৃষ্ঠার "এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ' কবিতাটি ১৩৪১ বৈশাখের মুকুল পত্রিকায় (নবপর্যায় পৃ ১-২) বাঘের শুচিতা' নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।" রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬৫২-৫৩।

সম্ভাবনাকে অবলম্বন করিয়া গল্পগুলি গঠিত বলিয়াই সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন যে, এতদিন রাজপুত্র, কোটালের পুত্র, সদাগরের পুত্রকে আশ্রয় করিয়া গল্প জমিয়া উঠিয়াছে, এবারে এই সর্বমানবের যুগে একটি অতিশয় সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করিয়া রূপকথা লিখিতে বাধা কি? তাহার একমাত্র পরিচয় সে মানুষের পুত্র, তাহার অধিক আর কিছু নয়, তাহার অধিক আর কী-ই বা হইতে পারে?[৯২]

আগের দিকে এক স্থানে বলিয়াছি যে, 'সে গ্রন্থটি বুঝিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ছবি ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিশ্বপরিচয় মনের মধ্যে জাগ্রত রাখা প্রয়োজন। ছবির সঙ্গেই 'সে'-র সম্বন্ধটা স্পষ্টতর। রবীন্দ্রনাথের ছবির মতোই 'সে' কিম্ভূত-রসাশ্রিত শিল্প। অনেকে যেমন মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের ছবি তেমন অবাস্তব নয়, উহা কিম্ভূত-রসাশ্রিত বাস্তব। সাধারণত ছবি বলিতে যাহা বুঝি, তাহা রূপের রূপ, রবীন্দ্রনাথের ছবি অরূপের রূপ। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে রূপ হইতে অরূপে গিয়াছেন, আর ছবির বেলায় অরূপ হইতে রূপে নামিয়াছেন। এই মূল কথাটা যে না বুঝিল, তাহার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও চিত্র দুইই দুর্বোধ্য হইয়া থাকিতে বাধ্য। এখন অরূপ আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কাজেই তাহার ছবিও কতক অস্পষ্ট হইয়া থাকিতে বাধ্য। ঐ অস্পষ্টতার আলো-আঁধারেই কিম্ভূতের লীলাভূমি। সেই যে-লীলাভূমি হইতে কবি ছবিগুলিকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেখান হইতেই 'সে'কেও বাহির করিয়াছেন।

আর বিশ্ব-পরিচয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে হুঁহাউ দ্বীপের কাহিনীতে।[৯৩] বৈজ্ঞানিক সত্যকে আশ্রয় করিয়া বালকের উপভোগ্য কাহিনী রচনার প্রচেষ্টা এই প্রথম নয়, আগেও আছে; এই শেষ নয়, পরেও আছে গল্পসল্প গ্রন্থে।

---

৯২ 'সে' ১ম অনুচ্ছেদ।

৯৩ বিশ্বপরিচয় (প্রকাশ ১৩৩৪ সাল), ২য় অনুচ্ছেদ।

সুকুমার বালকটির মধ্যে তিন সঙ্গী গ্রন্থের অভীককুমারের পূর্বগামিনী ছায়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে মনে হয়। দু'জনেই ছিল চিত্রকর, আর অবশেষে এঞ্জিনীয়ার হইবার উদ্দেশ্যে দু'জনেই বিলাত রওনা হইয়া গিয়াছে। অভীককুমার বাল্যকালে হয়তো বা সুকুমারের মতোই ছিল।

একাদশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত 'সে' এক রকম চলিয়া আসিয়াছে, এক প্রকার অলৌকিক গাঁজার ধোঁয়া পুঞ্জীভূত হইয়া তাহার দেহ ও ব্যক্তিত্ব যেন সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ দ্বাদশ অনুচ্ছেদে আসিয়া 'সে'র এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুর-বেসুরের যুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বসৃষ্টির যে ইতিহাস সে বর্ণনা করিয়াছে, অপরূপ কবিত্বে ও ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিয়াছে, তাহা পূর্বতন সে-র পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার Fancy এতক্ষণ যাহাকে Caricature-রূপে আঁকিতেছিল, এবারে তাহার Imagination তাহাকে সবলে সবেগে পূর্ণায়ত সৃষ্টির স্বর্গে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। দ্বাদশ অনুচ্ছেদটিই গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শেষের কবিতার প্রথমাংশে যে কিম্ভূত অমিত রায়কে দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে শিলং-এর অমিত রায়ের কতক পরিমাণে এই রকম পার্থক্য।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদটি ছাড়াও পরবর্তী দুটি অনুচ্ছেদও কবিত্বে ও ভাবের গভীরতায় পূর্বতন অনুচ্ছেদগুলির চেয়ে অনেক রস-সমৃদ্ধ। এই শেষ তিনটি অনুচ্ছেদে কবির কলম যেন পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

বলা বাহুল্য, 'সে' গ্রন্থের সর্বত্রই ভাষার ভঙ্গীতে ও Fancy-র লীলায় রবীন্দ্রনাথের হস্তচিহ্ন বর্তমান, শেষের তিনটি অনুচ্ছেদ তো অমূল্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বইখানা অল্পবয়স্কের সম্পূর্ণ উপভোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য এত অধিক যে, ছেলে-মেয়েরা তাহাদের মতো গ্রহণ করিবে আর বয়স্কগণ তাহাদের মতো গ্রহণ করিবে, তবু সব ফুরাইবে না। মহৎ লেখকের অকিঞ্চিৎকর রচনার ইহা একটি বৈশিষ্ট্য।

গল্পসল্প

"গল্পসল্প ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়।"[৯৪]

গল্পসল্প গ্রন্থে ষোলটি গল্প আছে, প্রত্যেকটি গল্পের সঙ্গে একটি করিয়া কবিতা সংযুক্ত, ঐ গল্পের ভাবার্থবাহী।

গল্পসল্পের অনেকগুলি গল্পের মূলে কবির বাল্যস্মৃতি বর্তমান। সেই সব স্মৃতির একহারা রূপ জীবনস্মৃতি বা ছেলেবেলায় পাওয়া যাইবে।[৯৫]

গল্পগুলি প্রত্যক্ষত অল্পবয়স্কদের জন্য লিখিত হইলেও এগুলির সম্যক রসগ্রহণ কেবল বয়স্কদের পক্ষেই সম্ভব। ক্ষীণকায় গল্পস্রোতের আড়ালে যে প্রচুর মননশীলতা বর্তমান—তাহাই এ গল্পগুলির প্রধান সম্পদ। আর প্রধাণতম সম্পদ গল্পসংলগ্ন কবিতাগুলি। গল্পগুলি সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে; কবিতাগুলি সম্বন্ধে সে অবকাশ সঙ্কীর্ণ।

শেষ কবিতাটিতে কবি যেন স্বহস্তে জীবন-রঙ্গমঞ্চের যবনিকাপাত করিয়া বাতি নিভাইয়া দিবার পূর্বে বিচিত্র জীবন-নাট্যের ভরতবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন—

> সাঙ্গ হয়ে এল পালা,
> নাট্যশেষের দীপের মালা
> নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে,

৯৪ "দু একটি মাত্র বাদে গল্পসল্পের সমস্ত রচনা রবীন্দ্রজীবনের শেষ বৎসরের ফসল।" রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬৫৩।

৯৫ রাজার বাড়ি, মুনশী, ম্যাজিশিয়ান, মুক্তকুন্তলা প্রভৃতি বাল্যস্মৃতিমূলক। 'রাজার বাড়ি'র ভাবাবলম্বনে শিশু কাব্যের রাজার বাড়ি কবিতাটি লিখিত।

রঙিন ছবির দৃশ্য রেখা
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা,
আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জ'মে।

সময় হয়ে এল এবার
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,
নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা;

খাতা হাতে এখন বুঝি
আসছে কানে কলম গুঁজি
কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা।

চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা
ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা
কোনোমতেই চলবে না তো আর

অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে
পড়বে ধরা শেষ গণিতে
জিত হয়েছে কিম্বা হ'ল হার॥

তিন সঙ্গী

রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গীর গল্পগুলি সম্বন্ধে সাহিত্যসমাজে মতভেদ আছে। কোন কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে সোহিনী চরিত্র সম্বন্ধে বিরূপ মত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি; তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, সোহিনী চরিত্রে সুদূরসম্ভাবনাপূর্ণ-উপাদানের অভাব নাই সত্য, কিন্তু সবশুদ্ধ মিলিয়া সেই পরিণতি নাই যাহার অপর নাম রূপ-পরিগ্রহ। এ বিষয়ে আমি ভিন্নমত পোষণ করি। ল্যাবরেটরি গল্পটি রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ বৎসরে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া আমার ধারণা।[৯৬]

কি ভাষার সাবলীল নমনীয়তায় এবং যথেচ্ছ কার্যকারিতায়, কি ঘটনার সুনিপুণ সংবিন্যাসে, কি ভাবনার আকাশ-চংক্রমণকারী পদক্ষেপে, আর কি চিত্রপরিকল্পনার জরাব্যাধিজয়ী দুঃসাহসিকতায় ল্যাবরেটরি গল্পের দোসর পাওয়া কঠিন। সমস্ত গল্পটি হইতে অস্তাচলাসীন সূর্যের শেষরশ্মিমদিরা বিচ্ছুরিত হইয়া পাঠককে যেন বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। এমনি বিভ্রান্তি বোধ করিয়াছিলাম প্রথম শেষের কবিতা পাঠের পরে। কিন্তু দু'য়ে প্রভেদ আছে। শেষের কবিতায় শেষরক্ষা হয় নাই, অমিতের প্রেম সম্পর্কিত রিয়ালিজম্ চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছায় নাই, মাঝপথে আইডিয়ালিজমের সঙ্গে আপস-রফা করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সোহিনী স্বতন্ত্র জাতের মানুষ, তাহার রিয়ালিজিম্ অত্যন্ত পাকা। এত বেশি পাকা যে, আইডিয়ালিজমের সঙ্গে আপস-রফার প্রয়োজন অনুভব করে নাই, বরঞ্চ নিজের দুঃসহ তাপে পাকিয়া উঠিয়া নিজেই এক প্রকার আইডিয়ালিজমে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে বলিতেন—

৯৬ তিনসঙ্গী ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী তথ্যপঞ্জীতে দ্রষ্টব্য।

"সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশানো খাঁটি রিয়ালিজম, অথচ তলায় তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজম্ই হ'ল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ" সেটা এই অর্থে বলিয়াই মনে হয়।

আবার বাঙালী বৈজ্ঞানিক নন্দকিশোরও স্বতন্ত্র জাতের মানুষ; তাহার রিয়ালিজম্ও, উহা এমন পোক্ত যে, আঙুর শুকাইয়া যেমন মনক্কা হয়, তেমনি আইডিয়ালিজম্ হইয়া উঠিয়াছে; তাই সে ল্যাবরেটরি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরের টাকা এ-হাত ও-হাত করিতে কুণ্ঠামাত্র বোধ করে না, যেমন কুণ্ঠামাত্র বোধ করে নাই সোহিনী সেই ল্যাবরেটরি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বোধ করিলে কায়িক সতীত্বকে লঙ্ঘন করিতে।

অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যে সোহিনী আকস্মিক নয়, তাহার দীর্ঘ পূর্বসূত্র আছে। এই পূর্বসূত্র সম্বন্ধে সচেতন হইলে সোহিনী সম্বন্ধে সুবিচার করা সহজ হইবে, কারণ কোন বস্তু বা মানুষকে আকস্মিক বলিয়া মনে হইলে তাহাকে নিয়মের ব্যতিক্রম গণনা করাই লোকের স্বভাব। রবীন্দ্রসাহিত্যে সোহিনী কোন নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, একটি পুরাতন নিয়মের পরম পরিণতি মাত্র।

রবীন্দ্রসাহিত্যে সোহিনীর অস্পষ্ট পূর্বরূপ চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানী। অর্জুনের বিদায়কালে চিত্রাঙ্গদা গৃহিণীতে ও প্রেয়সীতে মিলাইয়া রমণীর একটি আদর্শ চিত্র অঙ্কন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার প্রেয়সী রূপটিই প্রেমে ও লাবণ্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার দেবযানীর অপমানিত প্রেম পদাহত সর্পিণীর মনোরম ভীষণতায় বিদ্যুল্লতাবৎ কচকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখানে তো প্রেয়সী রূপটিই একমাত্র রূপ। কিন্তু এই দুই পৌরাণিক চিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ পূর্বসংস্কার দ্বারা বদ্ধ থাকায় যথেষ্ট স্বাধীনতা লইতে পারেন নাই। তার পরে চোখের বালির বিনোদিনীতে প্রেয়সী রূপের আর একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই। কিন্তু এখানেও কেমন

যেন কুণ্ঠার ভাব। রবীন্দ্রনাথ যেন নিজের সৃষ্ট চরিত্রের লেলিহান লালসায় নিজেকে ভীত বোধ করিয়াছেন, বিনোদিনীর প্রখর ব্যক্তিত্বের উপরে একটি গুণ্ঠন টানিয়া দিয়া তাহাকে দ্রুতহস্তে অপসারিত করিয়াছেন। অতঃপর অনেকদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীর দীপ্তিময়ী প্রেয়সী মূর্তি আর দেখা যায় না। তার বদলে দেখি, নারীর কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তি, আনন্দময়ী ও রাসমণিতে যাহার পরিপূর্ণ বিকাশ। প্রেয়সী মূর্তির পূর্বাভাস যেমন পাই চিত্রাঙ্গদাতে, মাতৃমূর্তির পূর্বাভাস তেমনি পাওয়া যায় রাজা ও রাণীর সুমিত্রা চরিত্রে। বস্তুত রাজা ও রাণীর নাটকীয় দ্বন্দ্বের মূল প্রেরণাটাই আসিয়াছে সুমিত্রার উপরে রাজার দাবিতে এবং প্রজার দাবিতে, অর্থাৎ প্রেয়সীত্ব ও জননীত্বের দাবিতে। কিন্তু যে কারণেই হোক, জননী মূর্তির শুভ্র শতদল এখানে পরিপূর্ণ প্রভায় বিকশিত হইতে পারে নাই। সে কল্যাণময় সৌন্দর্য দেখিবার জন্য আনন্দময়ী ও রাসমণি পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

অতঃপর রবীন্দ্রসাহিত্যের উত্তরকাণ্ডে আসিয়া দেখি যে, পালা-পরিবর্তন ঘটিল কিংবা প্রথম যুগের পালাটাই আবার ফিরিয়া দেখা দিল। এবারে কবির প্রেয়সী মূর্তি সাজাইবার পালা। ঘরে-বাইরের বিমলাতে জননী ও প্রেয়সী—দুটি উপাদানই আছে সত্য, কিন্তু প্রেয়সী উপাদানেরই মুখ্যতা। বাঁশরী সরকার দেবযানী চরিত্রের রূপান্তর, সে মুখ্যত প্রেয়সী। দুই বোনের ঊর্মিমালা প্রেয়সী জাতের শর্মিলা জননী জাতের এ কথা তো লেখক নিজেই বলিয়া দিয়াছেন। এ যুগেও তিনি জননী মূর্তি আঁকিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা প্রেয়সী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নিতান্তই নিষ্প্রভ।[৯৭]

কিন্তু এবারে আর একটি পালা-বদলের সূচনা। কবির শেষজীবনে অঙ্কিত কয়েকটি নারীচরিত্রের অর্থ যদি বুঝিয়া থাকি, তবে একটা জটিল সমস্যার গ্রন্থমোচন আবশ্যক হইয়া পড়ে।

৯৭ শর্মিলা ও নীরজা যথাক্রমে ঊর্মিমালা ও সরলার কাছে নিষ্প্রভ নয় কি?

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বিশ্বাস করিতেন যে, নারীর জীবনের চরম সার্থকতা মাতৃত্বে।[৯৮] তার পরে তিনি 'দুই নারী' তত্ত্ব প্রচার করিলেন।[৯৯] কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কোন মৌলিক দ্বন্দ্ব নাই, কারণ কালক্রমে প্রেয়সীরূপের ফুল জননী-পদের ফলে পরিণত হইতে পারে। কোন সমস্যার বেড়া না ডিঙাইয়াই এ পর্যন্ত বুঝি। কিন্তু কুমুদিনী (যোগাযোগ), অনিলা (পয়লা নম্বর), মৃণাল (স্ত্রীর পত্র) প্রভৃতি চরিত্রকে বুঝিতে হইলে একটা বেড়া ডিঙানো আবশ্যক, আর সে বেড়া না ডিঙাইলে সোহিনীর কাছে আসিয়া পৌঁছানো যায় না। এই সব নারীচরিত্রের ইঙ্গিতে কবি কি বলিতে চান যে, নারীজীবনের সার্থকতা প্রেয়সীত্বেও নয়, জননীত্বেও নয়, নারীত্বে?[১০০]

কুমুদিনী স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিল; তাহার কল্পিত প্রতিষ্ঠানভূমি প্রেয়সীত্বও নয়, জননীত্বও নয়, অগত্যা তাহাকে নারীত্বই বলিতে হয়। কিন্তু তাহার মনে পূর্বসংস্কার প্রবল ছিল, তাই যে-মুহূর্তে সে জানিতে পারিল যে, তাহার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে, অমনি সে স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিল। জননী-পদই তাহার

৯৮ শকুন্তলা; কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য।

৯৯ দুই নারী, বলাকা।

১০০ এই নারীত্ব নির্গুণ না সগুণ—জানি না। প্রেয়সীদের পরিণাম, জননী-পদের পরিণাম যদি নারীত্ব হয় তবে তাহা সগুণ। কিন্তু নারীত্ব যদি এই দুই ছাড়া আর কিছু হয়, তবে তাহাকে নির্গুণ বলিতে হয়। যে-নারী কোন পুরুষের প্রেম পাইল না বা জননী-পদ লাভ করিল না, যে-নারী সারাজীবন নিঃসঙ্গ কাটাইতে বাধ্য হইল, যুদ্ধসংকটজনিত ক্ষীয়মান পুরুষসংখ্যার বর্তমান যুগে এমন নারী নিশ্চয় অনেক আছে। আর এই 'বিশ্বযুদ্ধের যুগে' তেমন নারীর সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিবে। কাজেই নির্গুণ নারীত্ব মোটেই অবাস্তব নয়,—আর এই রকম একটা পথের আশ্বাস-আদর্শ সম্মুখে না থাকিলে 'বিশ্বযুদ্ধ যুগে'র নারীর পক্ষে জীবনধারণ করাই যে দুর্ঘট হইয়া দাঁড়ায়। ঠিক পুরাপুরি এখানে সমস্যাটি বাংলা সাহিত্যে এখনও দেখা দেয় নাই সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েকটি নারীচরিত্র তাহারই সূচক।

প্রতিষ্ঠানভূমি হইল। কুমুদিনীর 'নারীত্বে'র উপরে নির্ভর ক্ষণিক হইলেও তাহাকে মিথ্যা বলিতে পারি না। কিন্তু কবি আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। পয়লা নম্বরের নায়িকা অনিলা এবং স্ত্রীর পত্রের নায়িকা মৃণাল শেষ পর্যন্ত নারীত্বকেই একমাত্র ধ্রুবনির্ভর জ্ঞান করিয়া পতিগৃহ ত্যাগ করিয়াছে।[১০১] তাহা হইলে তিনটি পদ দেখিলাম—প্রেয়সী-পদ, জননী-পদ ও নারীত্ব-পদ। প্রেয়সী-পদের যোগ্যতম প্রতিনিধি যদি বিনোদিনী বা বাঁশরী হয়, জননী-পদের যোগ্যতম প্রতিনিধি যদি রাসমণি বা আনন্দময়ী হয়—তবে নারীত্ব পদের যোগ্যতম ও একমাত্র প্রতিনিধি সোহিনী। অনিলা ও মৃণাল তাহার অস্পষ্ট পূর্বাভাস ও অযোগ্য পূর্বসূরী; বাংলা সাহিত্যে এই পথে এখন পর্যন্ত সোহিনীই প্রাগ্রসরতম পথিক। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নারী-সম্বন্ধীয় তাঁহার পূর্ববর্তী ধারণা হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিয়াছেন।[১০২] যাই হোক, সোহিনীকে বিচার করিতে হইবে প্রেয়সীরূপে নয়, জননীরূপে নয়,—নারীরূপে, অর্থাৎ ব্যক্তিরূপে।

সোহিনী আদর্শ প্রেয়সী নয়; কেন নয়, সে নিজে একাধিকবার বলিয়াছে। প্রেমের আকর্ষণে সে নন্দকিশোরকে অবলম্বন করে নাই; করিয়াছিল নন্দকিশোরের অনমনীয় ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে; বুঝিয়াছিল যে, নন্দকিশোরের শক্ত ব্যক্তিত্ব পাইলে তবেই তাহার নিজের সুপ্ত ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইতে পারিবে। সোহিনী ভুল বোঝে নাই, ভুল করে নাই, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। আবার সোহিনী আদর্শ জননী নয়। তাহার একটিমাত্র সন্তান নীলিমা। সে নন্দকিশোরের সন্তান নয়, কাহার বলা শক্ত। উক্ত সন্তানের প্রতি

১০১ যথাস্থানে এ দুটি গল্প সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

১০২ কেবল এই কয়েকটি নারীচরিত্রের ভিত্তিতে এমন অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের আরও তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য আমার এই অনুমান সিদ্ধান্ত নয়—নতুন অনুসন্ধানের সূচনা মাত্র।

তাহার ব্যবহার আর যেমনি হোক,মাতৃজনোচিত নয়। নন্দকিশোরকে যেমন, নীলিমাকেও তেমনি সে ব্যবহার করিয়াছে আপন ব্যক্তিত্বের অস্ত্ররূপে। নীলিমা তাহার উপরে বিরূপ হইতে পারে, বিরূপ না হইলেই সে পাঠকের বিরাগভাজন হইত। এখন সোহিনী-চরিত্র হইতে প্রেয়সী-পদ ও জননী-পদ বাদ পড়িলে বাকি থাকে শুধু চরিত্রটা। নন্দকিশোর "দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেকটারের তেজ, বোঝা গেল নিজের দাম ও নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই।" এই চরিত্রই তাহার ব্যক্তিত্ব, সংসারেও ইহাই তাহার একমাত্র নির্ভর ছিল ; সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাহাই একমাত্র নির্ভর হওয়া উচিত। চরিত্রের দার্ঢ্যের মূল্যেই তাহার মূল্য, অন্য মূল্যের আরোপ চলিবে না। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর অভাব নাই, কিন্তু সর্বত্রই ব্যক্তিত্বের উপরে প্রেয়সীত্বের বা জননীত্বের আরোপ হইয়াছে।[১০৩] কিন্তু সোহিনীতে অন্যসংস্কারমুক্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নির্গুণ নারীত্ব যেমন সমুজ্জ্বলভাবে প্রকট এমন আর কোথাও হয় নাই। এখানেই সোহিনীর বৈশিষ্ট্য, সমালোচককে একমুহূর্তের জন্যও ইহা ভুলিলে চলিবে না।

সোহিনী প্রচলিত অর্থে সতী-রমণী নয়, প্রেয়সী ও জননীরূপেও তাহার দৃষ্টান্ত স্পৃহণীয় নয়, তবু সে খাঁটি ও অকৃত্রিম। শয়তান যে-অর্থে খাঁটি সেই অর্থে সে অকৃত্রিম। এ সত্য সে নিজেও জানিত, সে নিজেই প্রকাশ করিয়াছে। সে নন্দকিশোরকে বলিয়াছে, আমাদের পাড়ায় একজন ডাকসাইটে জ্যোতিষী আছে। সে আমার কুষ্টি গণনা ক'রে বলেছিল, একদিন দুনিয়ায় আমার নাম জাহির হবে। বলেছিল আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে। নন্দকিশোর বললে—বলো কি ! শয়তানের ? মেয়েটি বললে, জানো তো বাবুজি, জগতে সবচেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের।

১০৩ বোধ করি একমাত্র ব্যতিক্রম দেবযানী-চরিত্র।

তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। শয়তান-প্রভাবিত এই রমণী এতদিন পরে নন্দকিশোরের মধ্যে নিজের দোসর পাইয়াছে ; সে বলিয়াছে, "বাবু, রাগ কোরো না, তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমার হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।" সোহিনী বুঝিতে পারিয়াছে যে, নন্দকিশোরের উপরে শয়তানের দৃষ্টি অধিকতর প্রখর, সে কেবল তাহার দোসর নয়, বড় দোসর, তাই সে তাহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছে প্রেমের আকর্ষণে নয়, জননী হইবার আকাঙ্ক্ষায় নয়। সোহিনীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, নন্দকিশোর ঠকে নাই ; সোহিনী সমস্ত প্রকার নারীধর্ম বিসর্জন দিয়া কেবল কঠোর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরি রক্ষা করিয়াছে। ল্যাবরেটরি রক্ষার দ্বারাতেই সে তাহার অভিনব সতীধর্ম পালন করিয়াছে, প্রচলিত অর্থে ইহা কায়মনো-বাক্যগত সতীত্ব নয়, ইহাকে বলিতে পারি নারীব্যক্তিত্বের সতীত্ব বা স্বধর্ম পালন। এ সতীত্ব পতিনিষ্ঠ নয় কাজেই কায়িক পবিত্রতা ইহার পক্ষে অপরিহার্য নয়, ইহা সোহিনীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্যকারী ব্যক্তিনিষ্ঠ কৃতজ্ঞতা, তাই ইহার পক্ষে অপরিহার্যতম হইতেছে সোহিনীর ব্যক্তিত্বের খবরদারি, তাহাতে এতটুকু কার্পণ্য করে নাই।

[সতীনারীর চরিত্রমহিমার প্রতি মানুষের একটা শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটা বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই।"[১০৪] এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা

১০৪ বিলাত, জীবনস্মৃতি।

রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসাহিত্যে অসতী নারী কখনো উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু সোহিনীতে প্রথম ব্যতিক্রম দেখা গেল। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান যে, সতীত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব পূর্ণতর আদর্শ; কোন নারী সতী না হইয়াও মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্যে ভূষিত হইতে পারে: অন্তত সেই ঐশ্বর্যই সোহিনীর ভূষণ।[১০৫] তবু মনে রাখিতে হইবে যে, সোহিনী বাঙালী নয়, পাঞ্জাবী মেয়ে। শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্নের কমল বাঙালী হইলেও লেখক অতি সন্তর্পণে তাহার সমাজবহির্ভূত এক খাপছাড়া পটভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধারণ বাঙালীঘরের মেয়ে লৌকিক অর্থে অসতী হইয়াও মনুষ্যত্বধনে ধন্য হইল—এরূপ অভিমত করিতে লেখকদের সংস্কার বাধাস্বরূপ হইয়াছে।

শেষ কথা গল্পের অচিরা এক স্থানে সতীত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছে। নবীনের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিয়াছে—

"ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জনে এতদিন সেই আদর্শকে আমি পূজা করছিলুম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না।

আপনি শ্রদ্ধা করতে পারেন ভবতোষকে?

না।

তার কাছে যেতে পারেন?

না। কিন্তু সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা,

---

১০৫ বৌঠাকুরাণীর হাটের রুক্মিণী আত্মহত্যা করিয়াছে; যোগাযোগের শ্যামা অপহৃত ও অপমানিত হইয়াছে; চতুরঙ্গের ননীবালাও আত্মহত্যার দ্বারা সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের হীরা এবং শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী ও অচলার জীবনকথাও স্মরণীয়।

এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই।

ভালো বুঝতে পারছি নে।

আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের, উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়, যা কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ। অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।"

সতীত্বের প্রতি যাহাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা তাহাদের কাছেও অচিরার ব্যাখ্যা বাড়াবাড়ি মনে হইবে। অচিরা অপর কাহাকেও বিবাহ করিলে কেহ তাহাকে অসতী বলিবে না। কিন্তু নির্গুণ আদর্শরূপে বিচার করিলে অচিরার ব্যাখ্যাকে সমর্থন না করিয়া উপায় নাই।

আমাদের সমাজে স্বামী একটি মানুষ, আবার একটি আইডিয়াও বটে, সতীত্ব সেই আইডিয়ার প্রতি লয়ালটি বা নিষ্ঠা। অচিরা ভবতোষকে বিবাহ না করিলে তাহার মধ্যেই আইডিয়াটিকে উপলব্ধি করিয়াছে, কাজেই তাহার ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল হইলেও অবাস্তব নয়, তাই তাহার সতীত্বের ধারণাকে সমর্থন করিতে হয়। নৌকাডুবির কমলা রমেশের মধ্যে স্বামীরূপ আইডিয়াকে উপলব্ধি করিয়াছিল—পরে যখন প্রমাণিত হইল যে, রমেশ তাহার স্বামী নয়, নলিনাক্ষ স্বামী, যেমন আঘাত সে পাইবে লোকে আশঙ্কা করিয়াছিল তেমন কিছুই ঘটিল না, কারণ তাহার আইডিয়া তো আঘাত পায় নাই; কমলা সেই আইডিয়াকে নলিনাক্ষের উপরে আরোপ করিল; এবারে আইডিয়াতে ও রিয়ালে মিলিয়া গেল। ইহাই রবীন্দ্রনাথের সতীত্ব সম্বন্ধে চিরাগত ধারণা। অচিরার ব্যাখ্যা ও কমলার ব্যবহারের মধ্যে মূলগত বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু সোহিনীতে আসিয়া ইহার যেন মৌলিক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহার

সতীত্ব সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত পার্সোনাল, একটি বিশেষ পার্সনকে বাদ দিলে তাহার কোন অস্তিত্ব থাকে না, সেই পার্সনটি আবার পার্সোনালিটির সঙ্গে—এক্ষেত্রে লাবরেটরির সঙ্গে—অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাই ল্যাবরেটরির প্রতি তাহার এমন নিষ্ঠা। পাঞ্জাবী মেয়ে সোহিনী নিতান্তই বাস্তবে জড়িত, তাহা অচিরার নির্গুণ ইম্পার্সোনালিটি নয়। "আপন সৃষ্টি-শিখরের চূড়ান্তে সোহিনীরূপ আগ্নেয় কিরীট পরাইয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দিব্য লেখনীর লীলা সংবরণ করিয়াছেন। সোহিনী অস্তগমনোন্মুখ রবির শেষ কীর্তি হইয়াও মধ্যাহ্নজ্বালায় ভাস্বর, সায়াহ্নের গৈরিক তাহাকে একটুকুও কোমল করিতে পারে নাই। কেন এমন হইল, সে রহস্য ভেদ করিতে পারিলে সোহিনীর স্রষ্টার একটা গূঢ় পরিচয় পাওয়া যাইবে মনে হয়। সায়াহ্নের সূর্যকিরণে মধ্যাহ্নের অপ্রত্যাশিত অন্তর্জ্বালা আসিল মানব-মনোরহস্যের কোন্ সূত্রপথে ? জীবনের অপরিশোধিত কোন্ ঋণ সায়াহ্নের গৈরিক ঝুলি মধ্যাহ্নের স্বর্ণমুদ্রায় এমনভাবে নিঃশেষে শোধ করিয়া দিল ? এ রহস্যের অনুসন্ধান আবশ্যক।"[১০৬]

এ বিষয়ে আমি অন্য প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছি, এখানে তাহার উদ্ধার করিয়া দিতেছি।—

১

"কবির রহস্যলোকে অবতরণের তিনটি ধাপ বর্তমান—গদ্য-কবিতা, চিত্র ও শেষ বয়সে লিখিত কয়েকটি গল্প, সবগুলিই তাঁহার শেষ বয়সের কীর্তি। তাঁহার অন্যান্য রচনার সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ এই যে, প্রথম বয়সের রচনাগুলি পর্বে পর্বে, ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়াছে, আর শেষ বয়সের রচনাগুলির, তন্মধ্যে চিত্রও অন্যতম, মনোরহস্যের

১০৬ "সোহিনী", বাংলা সাহিত্যের নরনারী

রসাতলে অবরোহণমুখী। প্রথম বয়সের রচনা উচ্চেতনমুখী। উচ্চেতন বলিতে বুঝি ব্যক্তিগত চৈতন্যের ঊর্ধ্বে যে বিশ্বব্যাপী চৈতন্যলোক আছে তাহাই, ইহাকে বলিতে প্যারি বিশ্বচৈতন্য। আর অবচেতনা থাকে ব্যক্তিগত মনের অস্পষ্ট অন্ধকারে, জ্ঞানের সাধারণ আলোক সেখানে প্রবেশ করে না বলিয়া সেই রহস্যলোক সাধারণত অজ্ঞাত রহিয়া যায়। বিশ্বচৈতন্যে উন্নীত হইতে যেমন অনুপ্রেরণা আবশ্যক, অবচেতনার গহ্বরে নামিতেও তেমনি অনুপ্রেরণা আবশ্যক, অননুপ্রেরিত পক্ষে দুই-ই দুষ্প্রবেশ্য। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, দুই জাতীয় অনুপ্রেরণাই তাঁহার জীবনে কার্যকরী হইয়াছে—উচ্চেতনমুখী প্রথম দিকে, আর অবচেতনমুখী শেষ দিকে। শেষোক্ত অনুপ্রেরণার ইতিহাস বর্তমান তাঁহার গদ্য-কবিতায়, চিত্রাবলীতে এবং তিন সঙ্গী জাতীয় গল্পে।

"তবে সবগুলিতেই অনুপ্রেরণার তেজ প্রবল নহে, গদ্যকবিতায় অপেক্ষাকৃত মৃদু, তাহার দ্বিধা যেন সম্পূর্ণ কাটে নাই; চিত্রে, ল্যাবরেটরি গল্পে প্রবল, তখন সে নিঃসংশয়। রবীন্দ্রনাথ কেবল ত্রিকালদর্শী নহেন, ত্রিলোকদর্শীও বটেন। চেতন, উচ্চেতন ও অবচেতন তিন লোকেরই সংবাদ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

"গদ্যকবিতায় যে-জাতীয় বিষয়বস্তুর তিনি অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী কাব্যে তাহা নাই, এমন কি ছোটগল্পেও বিরল। অভিজ্ঞতার নূতন ক্ষেত্রে বিচরণের উদ্দেশ্যেই কবিতার গদ্যময় রূপটি তিনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। 'কিনু গোয়ালার গলি' নামে পরিচিত কবিতাটিতে রবীন্দ্র-রচনার সহিত তাঁহার একটা আন্তরিক অমিল আছে। তাঁহার পরিচিত সংসারের একান্তে দুর্ভাগ্যের যে আঁস্তাকুড় বর্তমান সেখানে তিনি প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন—অবচেতনলোকে নামিবার গুহা-দ্বারটা যে ঐ আঁস্তাকুড়ের নিকটেই। কিন্তু পূর্বতন সংস্কার কাটাইয়া না উঠিতে পারিবার ফলে সেখানে

একবারমাত্র পা ফেলিয়াই তিনি আবার উচ্চেতন লোকে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই কবিতাটির সমাপ্তি তাহার সূত্রপাতকে সমর্থন করে না। এটা যেন উচ্চতম ও অবচেতন লোকের সীমান্ত।

"রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রগুলি অবচেতন লোকের বার্তাবাহী। ছবিগুলির কালানুক্রমিক বিবর্তন আলোচনা করিলেও খুব সম্ভব একটি ক্রমবিকাশের চিহ্ন পাওয়া যাইবে—কিন্তু মোটের উপরে ইহাদের অবচেতন বার্তাবাহিতা নিঃসংশয়। রবীন্দ্রচিত্রে নরনারীর স্বাভাবিক রূপ বিরল, যাহা আছে তাহাও যেন গুপ্ত অভিজ্ঞতার আলোতে বিকৃত। স্বাভাবিক গাছপালার চিত্র অল্প হইলেও মানব-মূর্তির চেয়ে সংখ্যায় বেশি। সংখ্যাগৌরবে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ারের রূপ সুপ্রচুর। কিন্তু বোধ করি সংখ্যায় সবচেয়ে অধিক এমন সব জন্তুজানোয়ার ও উদ্ভিদ যাহাদের অনুরূপ মানুষের অভিজ্ঞতার বাহিরে। তাহারা কোন কিছুর অনুরূপ নয়—তাহারা নিছক রূপ। শিল্পবিচারে 'Imitation Theory' বলিয়া একটা পথ আছে, 'Imitation' বস্তুসাপেক্ষ, তাহা বস্তু-আশ্রয়ী সত্য, কিন্তু এই ছবিগুলির মূলে কোন বস্তুভিত্তি না থাকায়, ইহা কোন কিছুর 'Imitation' নয়, কোন কিছুর সত্য নয়, ইহা নিছক সত্য। এ যেন এমন কতকগুলি বস্তু যাহাদের ছায়া পড়ে না। কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করিবার উপায় না থাকাতে ইহাদের অবাস্তব মনে হওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু বস্তু ও তাহার ছায়ার মধ্যে ছায়াটাই কি অধিকতর বাস্তব? ছায়াটাই তো অপেক্ষাকৃত অবাস্তব। ছায়া লইয়া যাহাদের কারবার, সেই অবাস্তব-বিলাসীদের জন্য প্লেটো তাঁহার রিপাবলিকে একটু স্থানও রাখেন নাই। গুরুর এই একদেশ-দর্শিতার প্রতিবাদেই যেন অ্যারিস্টটলকে 'Imitation Theory' খাড়া করিয়া শিল্প ও সাহিত্যকে সমর্থন করিতে হইয়াছিল। শিল্পবিচারের Imitation Theory বা Criticism of Life Theory, কোনো থিয়োরীই অবচেতন লোকের শিল্পবিচার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

শেষোক্ত থিয়োরী অনুসারেও বিচারের জন্য এক অনুরূপ আবশ্যক। এই অনুরূপকেই ম্যাথু আর্নল্ড 'Moral Ideas' বলিয়াছেন। তাঁহার মতে Application of Ideas to Life দ্বারাই কাব্যের মহত্ত্ব প্রমাণ হয়—আর Application of Ideas to Life বলিতে দুটা বস্তু বোঝায়, Idea ও Life। কিন্তু বস্তু যেখানে দুটা নয়, মাত্র একটা, সেখানে Criticism of Life থিয়োরী সম্পূর্ণ অচল। কারণ এসব ছবিতে Life ও Idea দুটা নাই, মাত্র Ideaটাই আছে এবং সে Ideaটাও অবচেতন লোকের Idea (খুব সম্ভব সেখানে Idea ও Reality অভিন্ন), সেখানে সাহিত্য ও শিল্পবিচারের মাপকাঠি অচল। রবীন্দ্রনাথের ছবি এমন এক জগৎ যাহার মাপকাঠি ও কম্পাস এখনও অনাবিষ্কৃত। এখানকার নদী নদীমাত্র, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার জানিবার উপায় নাই; এখানকার জন্তু-জানোয়ার রূপমাত্র, তাহার অধিক নয়; এখানকার স্বল্পসংখ্যক নরনারীও নিছক রূপ, অতিরিক্ত কিছুই নয়। ইহা নিছক রূপময় জগৎ। রবীন্দ্রনাথ জাগতিক রূপ হইতে অরূপলোকে উত্থিত হইয়াছেন—ইহাই রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শিল্পের সাধারণ পরিচয়। জাগতিক রূপে ও অরূপে একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু তাঁহার ছবির জগতে কেবল রূপটাই আছে, কোনো অরূপলোকের সঙ্গে তাহাকে Equate করা, সম্বন্ধে যুক্ত করা, সম্ভব নহে। ইহা কি তাঁহার প্রতিভার ঐকান্তিক অরূপ-সাধনার Nemesis?

"রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অবচেতনের আকস্মিক অভ্যুদয়ের কারণ কি? তাঁহার পূর্বতন রচনা উচ্চেতনামূলক, তাহার লক্ষণ শান্তি, সংযম ও শালীনতা। তাদের স্থলে অধীরতা ও উদ্দামতার বিকাশের কারণ কি? সারাজীবনের সাধনালব্ধ ভারসাম্য হঠাৎ নষ্ট হইতে গেল কেন? অবচেতনলোকের সংবাদ আবর্তিত হইয়া উপরিতলে উঠিবার ফলেই অবশ্য এমন ঘটিয়াছে। কিন্তু সহসা এই আবর্তন কেন? বৃদ্ধবয়সে সজ্ঞান চেতনার মুষ্টি শিথিল হইলে অনেক সময়ে

এমন হইয়া থাকে। সচেতন মনের মতো অবচেতন মনেরও একটা দাবি আছে। বৃদ্ধবয়সে সাধারণ দাবি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আরও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথের যে কঠিন পীড়া হইয়াছিল; সেই সময়ে লুপ্তচৈতন্য অবস্থায় অবচেতন মনে অবগাহনের যে অভিজ্ঞতা তাঁহার ঘটিয়াছিল, সেটাকেও একটা কারণ বলিয়া মনে হয়। এই পীড়ার পরে প্রান্তিক কাব্যের অধিকাংশ কবিতা লিখিত। কাব্যখানিতে এমন সব কবিতা লিখিত আছে, কেবল সজ্ঞান মনের পরিপ্রেক্ষিতে যাহা দুর্বোধ্য। অবচেতন মনে অবগাহনজনিত অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখিলে তবেই তাহাদের বুঝিয়া ওঠা সম্ভব।

'বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের
অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে···
কোন্ ক্ষণে নটলীলা-বিধাতার নব নাট্যভূমে
উঠে গেল যবনিকা···
বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম
বিলয়ের তটে।'

এ সেই অবচেতনলোক।

'এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে,
সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে।'

এ দেশ হবে চেতনলোক।

'সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে

বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে, অযত্নে অনবধানে
হারালো প্রথম রূপ, দেবতার আপন স্বাক্ষর
লুপ্তপ্রায় ; ক্ষয়-ক্ষীণ জ্যোতির্ময়
আদিমূল্য তার।'

সজ্ঞান দৃষ্টি অবচেতনলোককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এবারে সেই অজ্ঞাত লোকের সন্ধান পাওয়া গেল।

'রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে যবে গেল দীপশিখা···
দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি-বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায়
কালো কলিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ।···
মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ঙ্কর, অকস্মাৎ
তব সভা হ'তে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গণে তব,
চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার।'

সজ্ঞান চৈতন্যের দীপ নিভিল, অবসন্ন চেতনার গোধূলি-বেলায় দেহখানা তাহার অভ্যস্ত অনুভূতিপুঞ্জ বহন করিয়া অবচেতনলোকের বিরাট প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাধির বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরে কবি পুনরায় সজ্ঞান মনের অভ্যস্ত ক্ষেত্রে ফিরিলেন বটে, কিন্তু নূতন কিছু সঙ্গে করিয়াও আনিলেন।

'পশ্চাতের নিত্য সহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি, প্রেতভূমি হ'তে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার।'

প্রেতভূমিচারী অতৃপ্ত তৃষ্ণার ছায়ামূর্তির মতো অকৃতার্থ অতীতের স্মৃতি কবির সঙ্গে সজ্ঞান মনের ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহার পরবর্তী অনেক রচনায় তাহাদেরই পদচিহ্ন।

'এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে,
বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ
ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হ'তে।'

পূর্বোক্ত প্রেতের হাতছানিই তাঁহাকে বারংবার অভিজ্ঞতার অভ্যস্ত ক্ষেত্র হইতে উধাও করিয়া দিয়াছে, আর তাহারই ইঙ্গিতচারী কবি সোহিনীর অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

প্রান্তিক রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হইতে পারে, কিন্তু নিঃসংশয়ে ইহা একটি পতাকীস্থান, সজ্ঞান মন ও অবচেতন মনের সীমান্তে এই পতাকা প্রোথিত। এই সাধারণ কথাটি মনে রাখিলে কবির পরবর্তী অনেক রচনার রহস্যবোধ সহজ হইবে। বৃদ্ধবয়সের দরুন সজ্ঞান চৈতন্যের মুষ্টি শিথিল হওয়াতে পূর্ব হইতেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও চিত্রে অবচেতন সৃষ্টির চিহ্ন দেখিতে পাই, আর ১৯৩৭-এর ব্যাধির অভিজ্ঞতায় অবচেতনলোকের সহিত মুখোমুখি হইবার পরে উভয় মনের সিংহদ্বার খুলিয়া যাওয়াতে তিন সঙ্গীর গল্পগুলিকে পাই। এই নূতন অভিজ্ঞতার চরম সোহিনী-চরিত্রে। সোহিনী অকৃতার্থ অতীতের সুযোগ্য প্রতিনিধি। প্রান্তিক কাব্যে যাহার নির্গুণ-তত্ত্ব, ল্যাবরেটরি গল্পে তাহার সগুণ-মূর্তি। সুদীর্ঘ কবিজীবনে ইহা যে উপান্ত-রচনা তাহা বোধ করি নিরর্থক নয়, কারণ ইতিপূর্বে তাঁহার হাত হইতে পাইয়াছি চেতন মনের ও উচ্চেতন মনের সৃষ্টি, অবচেতন মনের সৃষ্টি না পাইলে রবীন্দ্রকীর্তি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। রূপের সাধনা হইতে অরূপের সাধনায় যিনি পৌঁছিয়াছিলেন, গত-রূপের সাধনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অভিজ্ঞতার জপমালা আবর্তন তিনি সুসমাপ্ত করিলেন। সোহিনী-চরিত্র সমাপ্তির সেই সন্ধিস্থান—সেই হিসাবেই তাহার চরম মূল্য।"[১০৭]

১০৭ "সোহিনী", বাংলা সাহিত্যের নরনারী।

২

তিন সঙ্গীর গল্প তিনটির বিষয়-বস্তুতে একটি সাধারণ লক্ষণ আছে; ইহাদের প্রধান পাত্রগণ সকলেই বৈজ্ঞানিক; ঘটনাপ্রবাহও বিজ্ঞান-চর্চার খাতে প্রবাহিত; পাত্রপাত্রীগণের আলাপ-আলোচনাও বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলম্বী। ল্যাবরেটরি গল্পের নন্দকিশোর, অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরী ও রেবতী ভট্টাচার্য তিনজনেই বৈজ্ঞানিক। শেষ কথার অধ্যাপক অনিল সরকার ও নবীনমাধব দু'জনেই বৈজ্ঞানিক। আর রবিবার গল্পের অমর ও অভীকও বৈজ্ঞানিক, যদিচ অভীককে বৈজ্ঞানিক বলার চেয়ে মেকানিক বলাই সঙ্গত, তার উপরে আবার লোকটা চিত্রকর।

এখন স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জাগে, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিককে সাহিতের উপাদানরূপে গ্রহণ করিবার সত্যকার তাৎপর্যটা কি? বাঙালী সমাজের ক্ষুদ্রায়ত জীবনের অনেক অংশকেই ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এখন নূতন উপাদানের সন্ধানেই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিককে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের প্রতি বরাবর তাঁহার একটা কৌতূহল ছিল, এই কৌতূহলের টানেই তিনি জগদীশচন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু শেষজীবনে এই কৌতূহল বৃদ্ধি পায়, যাহার সাহিত্যিক ফল বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ, প্রকাশ ১৯৩৭ সাল। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি তরুণ ও প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেটাও বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণের একটা রকমফের। এই সব বিষয় স্মরণ রাখিলে তিনসঙ্গীর গল্পগুলির তাৎপর্যপূর্ণ একটা পটভূমি পাওয়া যাইবে। খুব সম্ভব তিনসঙ্গী নামটার মূলেও এই তাৎপর্যপূর্ণ ঐক্যটি বিরাজমান, তাই ইহারা তিন সঙ্গী, তিনটিই সহযাত্রী পথিক, নতুবা কেবল তিনটি গল্প মাত্র হইতে পারিত।

৩

শেষ কথার পরিবেশ একটি বন্য-জনপদ। নবীনের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসাবে এই অরণ্যভূমির আবশ্যক ছিল। কিন্তু অচিরার আত্মসন্ধানের ক্ষেত্ররূপেও তাহার একটি প্রয়োজন আছে—আর এই দুই প্রয়োজনের সূত্রে অরণ্যভূমিটি গল্পের সঙ্গে দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অচিরার সতীসাধনা মানুষের তপস্যা, তাহা আদিম প্রাণপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধনা। অরণ্যে রহিয়াছে সেই আদিম প্রাণপ্রবৃত্তির ভাণ্ডার, মানুষের অগোচরে তাহা মানুষকে প্রভাবিত করে, অচিরাকে তাহার তপস্যার কঠোরতা হইতে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে; অচিরা বলিয়াছে—"যে-চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল, তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে মাঝে এখানকার রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে, একদিন আমার দাদুর কাছ থেকে, আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বুঝি এমন প্রবৃত্তিরাক্ষস আছে। তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।" অচিরার সাধনার আলোকের পটভূমিরূপে অন্ধকার অরণ্যটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল, একটির দ্বন্দ্বে অপরটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। গল্পটির মধ্যে অরণ্যভূমি আসিয়াছে এই মৌলিক প্রয়োজনবশত সত্য, কিন্তু কবি তাহা হইতে অনেক গৌণ ফল আদায় করিয়া লইয়াছেন। অরণ্যের শোভাসৌন্দর্য, ফুল-ফলের মাধুর্য কবিকে অপরূপ কবিত্বের সুযোগ দিয়াছে।

৪

রবিবার গল্পটি ও ল্যাবরেটরি গল্পের পারিপার্শ্বিক একজাতীয় এবং দুটিই শেষের কবিতার ইঙ্গ-বঙ্গী সমাজ, না এদেশী না ওদেশী, শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার-আচরণে কলিকাতার বিত্তশালী কুশিক্ষিত এক সম্প্রদায়ের চিত্র। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কাছে হইতে এই সম্প্রদায়টিকে কটাক্ষে দেখিয়াছেন এবং সময়মতো ব্যবহারের জন্য তাহাদিগকে স্মৃতিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। কবি যে ইচ্ছা করিলে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বাস্তব-পন্থী হইতে পারেন এই সব চিত্র তাহার প্রমাণ।

রবিবারের অন্য সব পাত্রপাত্রী হইতে বিভা স্বতন্ত্র। তাহার চারিদিকে সর্বদা একটি শুচিতা ও সম্ভ্রম বিরাজ করিতেছে, খুব সম্ভব তাহার পরলোকগত ধর্মপ্রাণ পিতার প্রভাবে ইহা ঘটিয়াছে। শেষের কবিতার স্নো-পাউডার, হুইস্কি-চুরুট ও বাঁকা বুলির মধ্যে যেমন লাবণ্য, রবিবারের অনুরূপ আবহাওয়ায় মধ্যেও তেমনি বিভা।

রবিবারের নায়ক অভীককুমারে অমিত রায়ের মিশল আছে। দু'জনেই নিজ সমাজের মধ্যে প্রচণ্ড একটা প্রতিবাদ। অমিত যে-সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়াছে, সেই সমাজের কাছেই শেষ পর্যন্ত আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে ; কিন্তু অভীককুমার সে-সমাজের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সমুদ্রপারে যাত্রা করিয়াছে, তাহার অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধে বিদেশের বড়বাজারের সমর্থন আসিয়া বিভার শ্রদ্ধার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবে এই আশায়, এবং বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, নাস্তিক অভীককুমার আস্তিক্যের পথেই বিভাকে বিবাহ করিবে। নাস্তিকের ভগবানকে না মানিলেও চলে, কিন্তু সুন্দরী নারীকে না মানিয়া উপায় নাই।[১০৮]

১০৮ অভীক চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৫

এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম তাহা তাত্ত্বিক আলোচনা, সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে স্বভাবতই তাহা গৌণ ; এবারে গল্পগুলির রসপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে জরাবিজয়ী একটি চিরসরস মনের পদক্ষেপ গল্পগুলির চরিত্র-পরিকল্পনায়, কাহিনীবিন্যাসে এবং ভাষার সহজ শক্তির যথেচ্ছ ইন্দ্রজাল বিস্তারে। সোহিনী-চরিত্র সৃষ্টিতে, সোহিনী ও নীলিমার বিচিত্র সম্বন্ধজাল বয়নে যে-সাহসের আবশ্যক তাহা যৌবনেও দুর্লভ, অচির-অশীতি কবির সে সাহস কেমন করিয়া হইল ভাবিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। যথার্থ সাহস বোধ করি বার্ধক্যেরই ধর্ম।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিস্ময় অনুভব করি যখন দেখি যে, রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষা কি অভাবিত শক্তি লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বল্পাক্ষর গদ্য হ্রস্বকায় সংক্ষিপ্ত তরবারি। রবীন্দ্রনাথের হাতে গদ্যরীতি নানা মূর্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধের ভাষা ঈষৎ বক্র ভারতীয় তরবারি, তাহার ধারও যেমন, উজ্জ্বলতাও তেমনি ; আবার সোনার হাতলে পুষ্পালঙ্করণও অল্প নয়। তাঁহার ক্ষুধিত পাষাণের মতো গল্পের ভাষা—তাহা যেন ঐ বাদশাহী প্রাসাদেরই একখানা শ্বেতশিলাখণ্ড, বিচিত্র কারুমণ্ডিত, অপূর্ব লাবণ্যময়, তাহাতে মর্মরের শুভ্রতা ও শীতলতা দুই-ই বিদ্যমান ; দূর কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিন্যস্ত সেই প্রাসাদের মতোই তাহা কিয়ৎপরিমাণে যেন সাধারণের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। আবার জীবনস্মৃতি ও গোরাতে যে গদ্যকে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, শারদাকাশের ঊর্ধ্বতম সীমায় অবস্থিত বিস্তারিত-অথচ-অচঞ্চল-পক্ষ শ্যেনরাজের ন্যায় তাহা ভারসাম্যে উপনীত। চতুরঙ্গের ভাষা যেন অপগত বর্ষার বিপুল বালুকারাশি, তাহার স্তরে স্তরে ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার চিহ্ন, তাহার অঙ্গে অঙ্গে স্রোতের লীলাবঙ্কিম রেখারাজি; আর

রহিয়া রহিয়া এপিগ্রামের চিক্কণ মসৃণ বালুকাকণা অগ্নিকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সলিলোদ্ভূত হইলেও বাড়বানলের সঙ্গেও তাহার সম্বন্ধ বর্তমান। ঘরে-বাইরে ও পরবর্তী ছোটগল্প-সমূহের ভাষা সুভাষিতের জরির ফুল তোলা কবির অভ্যস্ত পরিধেয় ঢিলা জোব্বার মতো রেশমীকোমল, ভাঁজে ভাঁজে দেহগতির তরঙ্গময়। শেষের কবিতার ভাষা যেন ভাষার অসিক্রীড়া, শাণিত প্রখরতায় চক্ষু ধাঁধিয়া দেয়। গদ্যকবিতার ভাষা লতার মতো নমনীয়, কিন্তু এই পরিমাণে দৃঢ় যাহাতে লতার দোলনায় কল্পনার অনসূয়া-প্রিয়ংবদার দল-দোল খাইয়া যায় আর ঝরকে ঝরকে মালতী মাধবী-মঞ্জরী ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে। ছেলেবেলা ও তিনসঙ্গীর ভাষা অনুরূপ ; ছেলেবেলার চেয়েও তিনসঙ্গীর ভাষা আরও নমনীয়, আরও সহজ, আরও যথেচ্ছ ব্যবহারের উপযোগী ; একমাত্র অতি সূক্ষ্ম, অতি লঘু উত্তরীয়ের সঙ্গে তাহার উপমা চলে। উত্তরীয় শত প্রয়োজনের সঙ্গী। উত্তরীয়খানা গায়ে জড়ানো চলে, মাথায় জড়ানো চলে, কাঁধে বা গলায় জড়ানো চলে, প্রয়োজন হইলে পাতিয়া বসা চলে, আর আপদ্‌কালে বিপক্ষের গলায় জড়াইয়া সহজে তাহাকে আয়ত্তে টানিয়া আনা যায় ; পিরানের মতো তাহার ব্যবহারের সীমা সঙ্কীর্ণ নয়, তাহার অসীম কার্যোপযোগিতাই তাহার প্রধান গুণ। কবি তিনসঙ্গীর ভাষাকে সর্ববিধ কার্যক্ষেত্রে যথেচ্ছ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও আবার এমন অনায়াসে যে, মনে হয় না ইহাতে কোন শক্তি বা নৈপুণ্যের প্রয়োজন আছে। শিল্পোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ সহজ আত্মস্থ-ভাব, অনায়াসনৈপুণ্যের তলে কলাকৌশলের আত্মগোপন তিনসঙ্গীর ভাষার ছত্রে-ছত্রে। যে-কোন স্থান হইতে উদাহরণ উদ্ধার করা চলে —কি ব্যঙ্গে, কি বর্ণনায়, কি বিবরণদানে, কি মনের গভীরে সুপ্ত ভাবরাজির কৌতুক-কটাক্ষ উন্মীলনে এবং সবচেয়ে বেশি গল্পোপ-সংহারে অকস্মাৎ অট্টবজ্র-করতালিতে।—

"হঠাৎ আর একটা ছায়া পড়লো দেয়ালে। পিসিমা এসে

দাঁড়ালেন, বললেন, রেবি চলে আয়। সুড় সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকালো না।"

পাঠক গল্পটির উপসংহারের অনেক কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ঠিক এমনটি প্রত্যাশা করে নাই—হঠাৎ অট্টবজ্র-করতালিতে সে চমকাইয়া ওঠে, কিন্তু তখনি আবার মনে পড়িয়া যায় যে, রেবতীর অচঞ্চলাশ্রয়ী চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই একমাত্র যথার্থ উপসংহার।

আর একটি উদাহরণ লইতেছি।—

"নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা। রোদ্দুর পড়েছে তার কপালে তার চুলে, বেনারসী শাড়ির উপরে জরির রশ্মি ঝলমল করে উঠেছে। রেবতীর দৃষ্টি এক মুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে নিল পরক্ষণেই। ছেলেবেলা থেকে তার এই শিক্ষা। যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা, তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন সুযোগ ঘটে, তখন দৃষ্টির অমৃত ওকে তাড়াতাড়ি এক চুমুকে গিলতে হয়।" এখানে ভাষা যেন নীলার "বেনারসী শাড়ির উপরে জরির রশ্মি"র মতো ঝলমল করিতেছে।

আর একটি উদাহরণ—

"নানা রঙের ফুলগুলির মধ্যে নীলার সুঠাম আঙুল সাজাবার লয় রেখে নানা ভঙ্গীতে চলছিল, রেবতীর চোখ ফেরানো দায় হল। মাঝে মাঝে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। এক দিকে সেই মুখের সীমানা দিয়েছে চুনি-মুক্তো-পান্না-মিশোল-করা একহারা হার জড়ানো চুলের ইন্দ্রধনু, আর একদিকে বাসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছ্রিত রাঙা পাড়টি।"

অশীতিস্পৃষ্ট কবির অঙ্গুলিও ভাষার ফুলসজ্জায় নীলার সুঠাম অঙ্গুলির কোমলতা, নমনীয়তা ও নৈপুণ্য বিস্মৃত হয় নাই। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কবির দেহ জীর্ণ হইয়া পড়িলেও তাঁহার শিল্পী

আত্মা ও ধ্যানী সত্তা জরার আক্রমণের অতীত। তিনসঙ্গীর গল্পগুলিতে যুবকচিত্তের জয়পতাকা প্রোথিত করিয়া দিয়া কবি সরাসরি পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যপথে জরা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই।]

১ গল্পগ্রন্থের সূচী

ছোট গল্প। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও / প্রকাশিত। / ৫৫নং চিৎপুর রোড। / ১৫ ফাল্গুন ১৩০০ সাল। / মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ। পূজনীয় জ্যেষ্ঠসোদরোপম শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত সি. এস, মহাশয় করকমলেষু।

সূচী ॥ রাজপথের কথা, দেনাপাওনা, পোষ্টমাষ্টার, রাম কানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা, তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি, ব্যবধান, খাতা, সম্পাদক, একরাত্রি, ছুটি, দান প্রতিদান, কাবুলিওয়ালা, সমস্যা-পূরণ, গিন্নি, ঘাটের কথা, রীতিমত নভেল।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, উৎসর্গ, ও সূচী [।৵০] + ১৮৯। [১৯০] পৃষ্ঠা সাদা।

মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। প্র ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪।

বিচিত্র গল্প। / প্রথম ভাগ। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা; / ১৩।৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে / শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত / ও / ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / ১৩০১।

[১১২] পৃষ্ঠায়:

সাহিত্য-যন্ত্র; ১৩।৭ বৃন্দাবন বসুর লেন; হোগলকুঁড়িয়া; কলিকাতা।

সূচী ॥ অসম্ভব কথা, কঙ্কাল, স্বর্ণমৃগ, ত্যাগ, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, জয় পরাজয়, সম্পত্তি সমর্পণ।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র ও সূচী [।০] + ১১২।

মুদ্রণসংখ্যা ১০১০। প্র ৫ অক্টোবর ১৮৯৪। মূল্য বারো আনা।

বিচিত্র গল্প। / দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা; / ১৩।৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে / শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত / ও / ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / ১৩০১।

[১১২] পৃষ্ঠায়:

সাহিত্য-যন্ত্র; ১৩।৭ বৃন্দাবন বসুর লেন; হোগলকুঁড়িয়া; কলিকাতা।

সূচী ॥ দালিয়া, জীবিত ও মৃত, মুক্তির উপায়, সুভা, অনধিকার প্রবেশ, মহামায়া, একটা আষাঢ়ে গল্প, একটি ক্ষুদ্র ও পুরাতন গল্প।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র ও সূচী [।০]+১১২।

মুদ্রণসংখ্যা ১০১০। প্র ৫ অক্টোবর ১৮৯৪। মূল্য বারো আনা।

কথা-চতুষ্টয়। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা; / ১৩।৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে / শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত / ও / ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / ১৩০১।

গ্রন্থশেষে, ১৩০ পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠায়:

সাহিত্য-যন্ত্র; ১৩।৭ বৃন্দাবন বসুর লেন; হোগলকুঁড়িয়া, কলিকাতা।

সূচী ॥ মধ্যবর্ত্তিনী, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র ও সূচী [।০]+১৩০+[২]।

মুদ্রণসংখ্যা ১০১০। প্র ৫ অক্টোবর ১৮৯৪। মূল্য এক টাকা।

গল্প-দশক / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা; / ১৩।৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে / শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত / ও / ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন হইতে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / ১৩০২। / মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

উৎসর্গ। পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ আশুতোষ চৌধুরীর করকমলে এই গ্রন্থ উপহৃত হইল। ১৫ই ভাদ্র। ১৩০২। গ্রন্থকার।

সূচী ॥ প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, নিশীথে, আপদ, দিদি, মানভঞ্জন, ঠাকুর্দ্দা, প্রতিহিংসা, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ হাফ-টাইটেল, আখ্যাপত্র, উৎসর্গ ও সূচী [॥০]+২২০।

মুদ্রণসংখ্যা ॥ ১০০০। প্র ৩০ আগস্ট ১৮৯৫।

গল্প-গুচ্ছ। / (প্রথম খণ্ড) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। / শ্রীঅমূল্যনারায়ণ রায় দ্বারা "মজুমদার এজেন্সী" / হইতে প্রকাশিত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। / ৫৫ নং চিৎপুর রোড। / ১লা আশ্বিন ১৩০৭ সাল। / মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সূচী ॥ খোকাবাবু, পোষ্টমাষ্টার, দেনাপাওনা, দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়, উদ্ধার, ছুটি, সদর ও অন্দর, মহামায়া, রামকানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা, কাবুলিওয়ালা, সম্পত্তি সমর্পণ, ব্যবধান, একরাত্রি, খাতা, মানভঞ্জন, দিদি, তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি, দুর্ব্বুদ্ধি, আপদ, সম্পাদক, নিশীথে, দান প্রতিদান, জয় পরাজয়, প্রতিহিংসা, ঠাকুর্দ্দা, স্বর্ণমৃগ, প্রতিবেশিনী, ফেল্‌, অনধিকার প্রবেশ, ত্যাগ।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র [২] + সূচী ৵০ + ৪৪৮।

মুদ্রণসংখ্যা ১১০০। প্র ১৯ অক্টোবর ১৯০০।

গল্প। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক / প্রণীত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত। / ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। / ১৩০৭ সাল

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট--"মজুমদার লাইব্রেরী" হইতে / শ্রীঅমূল্যনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক / প্রকাশিত।

সূচী ॥ জীবিত ও মৃত, শুভদৃষ্টি, সমস্যা-পূরণ, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্ত, সুভা, বিচারক, একটা আষাঢ়ে গল্প, মধ্যবর্ত্তিনী, উলুখড়ের বিপদ, ক্ষুধিত পাষাণ, মেঘ ও রৌদ্র, দুরাশা, ডিটেক্‌টিভ্‌, অতিথি, শাস্তি, অধ্যাপক, রাজটীকা, মণি-হারা, দৃষ্টি-দান, সমাপ্তি।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র [২] + সূচী ৵০ + ৪৪৯—৯২৯। [৯৩০] পৃষ্ঠা সাদা।

মুদ্রণসংখ্যা ১১০০। প্র ৪ মার্চ ১৯০১।

ইহা গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রথম খণ্ডের পর হইতে। আখ্যাপত্রে ও গ্রন্থমধ্যে 'গল্প' বলিয়া উল্লিখিত ; মলাটে লিখিত আছে--গল্পগুচ্ছ / (দ্বিতীয় খণ্ড) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মলাট-যুক্ত একটি কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে (সংখ্যা ১৬৯৩৯)।

প্রথম খণ্ডেও, আখ্যাপত্রে গ্রন্থের নাম 'গল্পগুচ্ছ' মুদ্রিত হইলেও পরে সর্বত্র 'গল্প' মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীসুকুমার সেন উল্লেখ করিয়াছেন, "'গল্প' বাহির হইয়াছিল খণ্ডে খণ্ডে, একটানা পৃষ্ঠাঙ্কে। প্রত্যেক খণ্ডের মলাটে নাম ছিল 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ'।"

শ্রীসুকুমার সেনের নিকট ইহার একটি খণ্ড আছে। আখ্যাপত্র নাই; মলাটে মুদ্রিত আছে—

রবীন্দ্রনাথের / **গল্পগুচ্ছ** / (দানপ্রতিদান, জয় পরাজয়, প্রতিহিংসা, ঠাকুর্দ্দা, স্বর্ণমৃগ, প্রতিবেশিনী, ফেল্, / অনধিকার প্রবেশ, / ত্যাগ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত / প্রকাশক—মজুমদার লাইব্রেরী। ২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ডের একটি অংশ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩১৭-৪৪৮।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে এইরূপ একটি খণ্ড আছে (ক্রমিক সংখ্যা ১৬৯৩৬)। আ্যাখাপত্র নাই ; মলাটে মুদ্রিত আছে —

রবীন্দ্রনাথের / **গল্পগুচ্ছ** / (ডিটেক্‌টিভ ;—অতিথি, শাস্তি, অধ্যাপক, রাজটীকা, মণিহারা) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত / প্রকাশক—মজুমদার লাইব্রেরী। ২০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, / কলিকাতা।

ইহা গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডের একটি অংশ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৯৭-৮৫২।

কর্ম্মফল। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। কুন্তলীন আফিস হইতে / শ্রীএইচ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / কলিকাতা ; / ১৩১০ সন।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

কুন্তলীন প্রেস হইতে / শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র।

"গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। আমার রচিত এই ক্ষুদ্র গল্পটি গ্রহণ করিয়া কুন্তলীনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাহায্যার্থে তিনশত টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

কর্মফল 'কুন্তলীন পুরস্কার'-রচনা[১] বলিয়া বিবেচিত। কুন্তলীনের স্বত্বাধিকারী এইচ বসু (হেমেন্দ্রমোহন বসু) অনেক বৎসর ধরিয়া প্রতিবর্ষে কুন্তলীন-পুরস্কার-গ্রন্থ প্রকাশ করিতেন, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি তাঁহার প্রখ্যাতনামা বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতেও রচনা সংগ্রহ করিতেন।

১। নিয়মিত পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থ না বলিয়া বিশেষ 'কুন্তলীন'গ্রন্থ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ১৩১৭ সালে এইচ বসু, কর্ত্তৃক প্রকাশিত "কুন্তলীন পুরস্কারের দ্বাদশ প্রথম (১৩০৩-১৩১৫)" গ্রন্থে "কর্মফল" (১৩১০) নাই। এইচ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও স্বর্গীয় হেমেন্দ্রমোহন বসু (এইচ বসু)র স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্পিত "সন ১৩২৩ সনের সচিত্র কুন্তলীন "পুরস্কার" গ্রন্থে "কর্মফল" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

কুন্তলীন-পুরস্কারের নিয়ম ছিল "গল্পের সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন স্বরূপ বিবেচিত না হয়।" কর্মফলে কুন্তলীন বা দেলখোসের উল্লেখ নাই, তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে—

"মন্মথ। ওকিও তোমার ছেলেটিকে কি মাখিয়েছে?

বিধু। মূর্চ্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়—একটুখানি এসেন্স মাত্র। তাও বিলাতি নয়— তোমাদের সাধের দিশি!"

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র ও গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন [।০]+৯২+গ্রন্থকারের প্রতিকৃতি।

মুদ্রণসংখ্যা ২০০০। প্র ২২ ডিসেম্বর ১৯০৩।

হিতবাদির উপহার। / রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী। / কলিকাতা। ৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদি-কার্য্যালয় হইতে / শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার কর্ত্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১৩১১ সাল।

এই গ্রন্থাবলীর প্রথমে 'গল্পাংশে' গল্পগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। যথা—সংসার চিত্র, সমাজচিত্র, রঙ্গচিত্র, বিচিত্র চিত্র।

গল্পের সূচী ॥ সংসার চিত্র: নিশীথে, আপদ, দিদি, মধ্যবর্ত্তিনী, শাস্তি, সুভা, প্রতিহিংসা, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, অতিথি, গিন্নি, একরাত্রি, ছুটি, দান প্রতিদান, কাবুলিওয়ালা, রামকানাইযের নির্ব্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, খাতা, উদ্ধার, দুর্ব্বুদ্ধি, দৃষ্টিদান, শুভদৃষ্টি, উলুখড়ের বিপদ।

সমাজচিত্র: প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, মেঘ ও রৌদ্র, ত্যাগ, মহামায়া, অধ্যাপক, সমস্যা-পূরণ, দেনাপাওনা, পোষ্টমাষ্টার, সম্পাদক, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, দুরাশা, প্রতিবেশিনী, ফেল।

রঙ্গচিত্র: চিরকুমার সভা, মানভঞ্জন, ঠাকুর্দ্দা, মুক্তির উপায় রাজটীকা।

বিচিত্র চিত্র: ক্ষুধিত পাষাণ, অনধিকার প্রবেশ, দালিয়া, জীবিত ও মৃত, ডিটেক্‌টিভ, জয় পরাজয়, অসম্ভব কথা, কঙ্কাল, স্বর্ণমৃগ, মণিহারা, একটা আষাঢ়ে গল্প, একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প, ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, রীতিমত নভেল, সমাপ্তি।

ভারতী (বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮) পত্রে প্রকাশিত নষ্টনীড় এই গ্রন্থাবলীতে উপন্যাস-বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে, পরে ইহা গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত হয়।

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী কেবল গল্পের সংগ্রহ নহে। তবু যে গল্পগ্রন্থের তালিকায় ইহার উল্লেখ করা হইল তাহার কারণ, গল্পগুচ্ছ দুই খণ্ডের (১৩০৭) পর এই গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব গল্প একত্র সংকলিত হইয়াছে। ভাবানুষঙ্গক্রমে গল্পগুলি সাজানো হইয়াছে, তাহাও লক্ষণীয়। গিন্নি গল্পটি গল্পগুচ্ছে বাদ পড়িয়াছিল, এই গ্রন্থে পুনঃসংকলিত হইয়াছে; সদ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কর্মফল ইহার অন্তর্গত হয় নাই; চিরকুমার-সভা (ভারতী, বৈশাখ-কার্তিক, পৌষ-চৈত্র, ১৩০৭; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮) ইহাতে গল্প-বিভাগে সংকলিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ (গল্প-অংশের) ১—৫০৪। নষ্টনীড় ১১৩-৫৫।

মুদ্রণসংখ্যা ১০০০০। প্র ২৯ আগস্ট ১৯০৪। মূল্য (সমগ্র গ্রন্থাবলীর) এক টাকা দুই আনা।

গল্পগুচ্ছ / (প্রথম ভাগ) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / মূল্য ১৲ এক টাকা—

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায়:

প্রকাশক / কলিকাতা—ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস / ৭৩১ সুকীয়া ষ্ট্রীট। / এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান প্রেস। / কলিকাতা, / ১৭নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন; / "কালিকা-যন্ত্রে" / শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী ॥ জীবিত ও মৃত, শুভদৃষ্টি, সমস্যা পূরণ, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্ত, সুভা, বিচারক, একটি আষাঢ়ে গল্প, মধ্যবর্ত্তিনী, উলুখড়ের বিপদ, ক্ষুধিত পাষাণ, মেঘ ও রৌদ্র, ফেল্।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র ও সূচী [।০]+২২৩। [২২৪] পৃষ্ঠা সাদা। প্রকাশকাল মুদ্রিত নাই।

মুদ্রণসংখ্যা ১০৫০। প্র ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৮।

গল্পগুচ্ছ / (দ্বিতীয় ভাগ) / দ্বিতীয় সংস্করণ / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / মূল্য ১৲ এক টাকা।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায়:

প্রকাশক / কলিকাতা—ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্ / ৭৩১ সুকীয়া ষ্ট্রীট্। / এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস। / কলিকাতা / ২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ / প্যারাগন প্রেসে / শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী ॥ খোকাবাবু, পোষ্টমাষ্টার, দেনাপাওনা, দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়, উদ্ধার, ছুটি, সদর ও অন্দর, মহামায়া, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, কাবুলিওয়ালা, সম্পত্তি সমর্পণ, ব্যবধান, একরাত্রি, খাতা, মানভঞ্জন, দানপ্রতিদান।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র ও সূচী [।০]+২২৪। প্রকাশকাল মুদ্রিত নাই।

মুদ্রণসংখ্যা ১০৫০। প্র ১২ অক্টোবর ১৯০৮।

গল্পগুচ্ছ / (তৃতীয় ভাগ) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / দ্বিতীয় সংস্করণ / মূল্য ১৲ এক টাকা—

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

প্রকাশক / কলিকাতা—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, ৭৩।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। / এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান প্রেস। / কলিকাতা / ১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, / "কালিকাযন্ত্রে" / শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী ॥ দুরাশা, ডিটেকটিভ্, অতিথি, শাস্তি, অধ্যাপক, রাজটীকা, মণি-হারা, দৃষ্টিদান, সমাপ্তি।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র ও সূচী [।০] + ২৪৮ + বিজ্ঞাপন ।০। প্রকাশকাল মুদ্রিত নাই।

মুদ্রণসংখ্যা ১০৫০। প্র ২ জানুয়ারী ১৯০৯।

গল্পগুচ্ছ / (চতুর্থ ভাগ) / দ্বিতীয় সংস্করণ / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

প্রকাশক। কলিকাতা—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্ / ৭৩।১ সুকীয়া ষ্ট্রীট / এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস / প্যারাগন প্রেস / ২০৩।১।১ কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট / কলিকাতা। / শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী ॥ দিদি, তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি, দুর্ব্বুদ্ধি, আপদ, সম্পাদক, নিশীথে, জয় পরাজয়, প্রতিহিংসা, ঠাকুর্দ্দা, স্বর্ণমৃগ, প্রতিবেশিনী, অনধিকার প্রবেশ, ত্যাগ।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র ও সূচী [।০] + ১৯৯। [২০০] পৃষ্ঠা সাদা + বিজ্ঞাপন ।০। প্রকাশকাল মুদ্রিত নাই।

মুদ্রণসংখ্যা ১০৫০। প্র ৪ জানুয়ারি ১৯০৯।

গল্পগুচ্ছ / (পঞ্চম ভাগ)। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত / মূল্য ১৲ এক টাকা।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

প্রকাশক / শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস ' ৭৩।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা / এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান প্রেস / ১৩১৫ কলিকাতা—২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভাতরমিহির যন্ত্রে, / শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী ॥ নষ্টনীড়, কর্মফল, গুপ্তধন, মাষ্টার মশায়।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, সূচী ও বর্ণানুক্রমিক সূচী (পাঁচ খণ্ডের) ।৶০ + ২৩৩। [২৩৪] পৃষ্ঠা সাদা।

মুদ্রণসংখ্যা ১০৫০। প্র ৮ এপ্রিল ১৯০৯।

আটটি গল্প। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / মূল্য বারো আনা।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায়।

প্রকাশক / শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র / ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস / ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা / কান্তিক প্রেস / কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা / শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

"নিবেদন। ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকরূপে গল্পের বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে ইহা আমরা অনুভব করিয়াছি। সেই জন্যই "গল্পগুচ্ছ" হইতে বালক-বালিকাদের পাঠোপযোগী আটটি গল্প নির্বাচন করিয়া লইয়া এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করা হইল।"

সূচী ॥ খোকাবাবু [খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন], সাক্ষী [রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা], কাবুলিওয়ালা, স্বর্গমৃগ, দান প্রতিদান, অনধিকার প্রবেশ, গুপ্তধন, মাষ্টার মশায়।

এই গ্রন্থে নূতন গল্প না থাকিলেও, গল্পগুলি 'বালকবালিকাদের পাঠোপ-যোগী' করিবার জন্য স্থানে স্থানে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্যণীয়।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র ও নিবেদন [।০] + ১৩৬। প্রকাশকাল মুদ্রিত নাই।

মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। প্র ২০ নভেম্বর ১৯১১।

গল্প চারিটি / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / মূল্য দশ আনা

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

প্রকাশক / শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় / আদিব্রাহ্মসমাজ / ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা / আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্ / ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা / শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

সূচী ॥ রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা, দর্পহরণ, মাল্যদান।

"এই চারিটি গল্পের মধ্যে দর্পহরণ ও মাল্যদান ১৩০৯ সালে লিখিত হইয়াছিল।"

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র ও সূচী [।০]+১২০। প্রকাশকাল মুদ্রিত নাই।

মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। প্র ১৮ মার্চ ১৯১১।

গল্পসপ্তক / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রকাশক / ইণ্ডিয়ান প্রেস / এলাহাবাদ / মূল্য ১৲ টাকা।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

প্রাপ্তিস্থান—/ ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ / ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস / ২২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। / Printed and published by Apurva Krishna Bose at the Indian Press. / Allahabad

সূচী ॥ হালদার-গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা।

প্রকাশ-তারিখ মুদ্রিত নাই। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়ে ১৩২৩ আশ্বিন প্রবাসী হইতে বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"গল্পসপ্তক···পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে।"

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র ও সূচী [।০] +২০৪।

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পপুলার সিরিজ বৈশাখ ১৩২৭ / শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / **পয়লা-নম্বর** / সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲ প্রতি সংখ্যা ।৵০, ভিঃ পিতে ।০ / শিশির পাবলিশিং হাউস।

গ্রন্থশেষে, ৭২ পৃষ্ঠায় :

কলিকাতা, ৯৬নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, এল্, এন্, প্রেস হইতে /

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, / শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীশিশির কুমার মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইহার কোনো আখ্যাপত্র নাই। মলাটে ও গ্রন্থশেষে প্রদত্ত মুদ্রণ ও প্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্য উপরে মুদ্রিত হইয়াছে।

সূচী॥ পয়লা নম্বর, তপস্বিনী, তোতা-কাহিনী, কর্ত্তার ভূত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা॥ ৭১+সাহিত্য সংবাদ ১, বিজ্ঞাপন (গ্রন্থারম্ভে ১৬, গ্রন্থশেষে ৪৮)। 'স্বাস্থ্যচিত্র' ও বিজ্ঞাপনচিত্র ২।

মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। প্র ৫ এপ্রিল ১৯২০।

লিপিকা / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রকাশক / ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড / এলাহাবাদ /১৯২২ / মূল্য একটাকা বারো আনা।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায়:

প্রকাশক / শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু / ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ / প্রাপ্তিস্থান: / ১। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস | ২২।১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা / ২। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ / কান্তিক প্রেস / ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা / শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

"রবীন্দ্রনাথের ··আরও কতকগুলি রচনা আছে যাহাতে ছোটগল্পের লক্ষণ আংশিক থাকিলেও সমগ্রভাবে নাই।...কোন কোনটিতে ছোটগল্পের আদল মাত্র আছে। সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় ছোটগল্প লেখার তৃতীয় যুগের অবসান হইয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের গল্পের টুকরা বা "কথিকা" অনেকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি 'লিপিকা'-য় (১৯২২) প্রাপ্তব্য।"– শ্রীসুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৩।

লিপিকা "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প" গ্রন্থের আলোচ্যসীমার অন্তর্গত নয়। লিপিকার অন্তর্ভুক্ত রচনাবলীর সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য লিপিকা পৌষ ১৩৫২ সংস্করণে দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠাসংখ্যা॥ আখ্যাপত্র ও সূচী ॥০+১৮২।

মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। প্র ১৭ অগস্ট ১৯২২।

গল্পগুচ্ছ / (প্রথম খণ্ড) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২১০, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায়:

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / প্রকাশক—শ্রীজগদানন্দ রায় / ২২০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা / মূল্য কাগজের মলাট ২৲ / বাঁধাই ২॥০ / প্রিন্টার—রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায় / গদাধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড / ১২৪।২।১ নং মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

"ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ নূতন আকারে প্রকাশিত হইল। ইহাতে পূর্ব্ব সংস্করণের 'গল্পগুচ্ছ', 'গল্পচারিটি' ও 'গল্পসপ্তক' অন্তর্গত সমস্ত গল্পই আছে, তদ্ভিন্ন পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, এইরূপ কয়েকটি গল্পও এই নব সংস্করণে সন্নিবেশিত করা হইল। গল্পগুলি প্রকাশের সময় ধরিয়া সাজান হইয়াছে। ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।"

সূচী ॥ ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, দেনা-পাওনা, পোষ্ট মাষ্টার, গিন্নি, রাম-কানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়, ত্যাগ, একরাত্রি, একটা আষাঢ়ে গল্প, জীবিত ও মৃত, রীতিমত নভেল, স্বর্ণ-মৃগ, জয় পরাজয়, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, সুভা, দান প্রতিদান, মহামায়া, সম্পাদক, মধ্যবর্ত্তিনী, অসম্ভব কথা, শাস্তি, একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প, সমাপ্তি, সমস্যা পূরণ, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, প্রতিবেশিনী, খাতা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র [৵০] + সূচীপত্র ৵০ + ভূমিকা [৵০] + ১-৩৩১। [৩৩২] পৃষ্ঠা সাদা। প্রকাশকাল উল্লিখিত নাই।

মুদ্রণসংখ্যা ৪২০০। প্র ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬।

১৩৫৩ সালের ভাদ্র মাসে বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ডের একটি 'নূতন সংস্করণ' প্রকাশিত হয়। ইহাই বর্তমানে প্রচলিত। উহাতে 'বাংলা ১২৯১ হইতে ১৩০০ সালের মধ্যে প্রকাশিত গল্পগুলি প্রথম প্রকাশের ক্রম-অনুযায়ী সংকলিত হইল।...রচনার শেষে সাময়িকপত্রে প্রকাশের কাল মুদ্রিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষ গল্প 'খাতা' সম্ভবতঃ ১২৯৮ সালে হিতবাদী পত্রে প্রকাশিত; সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই বলিয়া উহা গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের তারিখ-অনুসারে (ছোটগল্প : ফাল্গুন ১৩০০) সংকলিত হইল।'

ফলে কোনো কোনো গল্পের ক্রম পরিবর্ত্তন হয়, এবং যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ ও প্রতিবেশিনী এই তিনটি গল্প গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডের 'নূতন সংস্করণ'এর (মাঘ ১৩৫২) অন্তর্ভুক্ত হয়; এই তিনটি গল্পও গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ অনুসারে (গল্পগুচ্ছ ১।২, ১৩০১) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গল্পগুচ্ছ / দ্বিতীয় খণ্ড / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় / ২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় / প্রকাশক—শ্রীজগদানন্দ রায় / ২১০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা / মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র / প্রিন্টার—শ্রীরামরঞ্জন মুখোপাধ্যায় / গদাধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড, / ১২৪।২।১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী ॥ অনধিকার প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, নিশীথে, আপদ, দিদি, শুভদৃষ্টি, মানভঞ্জন, ঠাকুর্দ্দা, প্রতিহিংসা, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি দুরাশা, পুত্রযজ্ঞ, ডিটেক্‌টিভ্, অধ্যাপক, রাজটীকা, মণিহারা, দৃষ্টিদান, উদ্ধার, দুর্ব্বুদ্ধি, ফেল, সদর ও অন্দর, নষ্টনীড়, দর্পহরণ, মাল্যদান।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র [✓০] + সূচীপত্র ✓০ + ৩৩৩-৭৪৭। [৭৪৮] পৃষ্ঠা সাদা। প্রকাশকাল মুদ্রিত নাই।

মুদ্রণসংখ্যা ৪২০০। প্র ১০ ডিসেম্বর ১৯২৬।

বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছের ‘বৈশাখ ১৩৪১’ মুদ্রণে অতিথি গল্পের পরে ইচ্ছাপূরণ গল্পটি যোগ করা হইয়াছে—ইতিপূর্ব্বে এ রচনাটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই ; রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত শিশুপাঠ্য রচনার সংকলন ‘পার্ব্বণী’তে (১৩২৫) মুদ্রিত হইয়াছিল।

(এই ‘বৈশাখ ১৩৪১’ সংস্করণকে পুনর্মুদ্রণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; প্রথম প্রকাশের তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১৩০৭, অর্থাৎ মজুমদার এজেন্সী / লাইব্রেরী সংস্করণ গল্পগুচ্ছের তারিখ। বস্তুত ইহা, [১৩৩৩ বা ১৯২৬] সালে প্রকাশিত বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডের সংস্করণ—বর্তমানে ‘পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ’ বলিয়া উল্লিখিত)।

১৩৫২ সালের মাঘ মাসে বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডের একটি ‘নূতন সংস্করণ’ প্রকাশিত হয়। উহাতে ‘শ্রাবণ ১৩০১ হইতে চৈত্র ১২০৯-এর মধ্যে প্রকাশিত গল্পগুলি প্রকাশের ক্রম-অনুসারে মুদ্রিত হইল।’ ইহাই বর্তমানে প্রচলিত।

গল্পগুচ্ছ / (তৃতীয় খণ্ড) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২১০, কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় / প্রকাশক—শ্রীজগদানন্দ রায় / ২১০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা / মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র / প্রিন্টার—শ্রীরামরঞ্জন মুখোপাধ্যায় / গদাধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড, / ১২৪।২।১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী॥ কর্ম্মফল, গুপ্তধন, মাষ্টার মশায়, রসময়ীর ছেলে, পণরক্ষা, হালদার-গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা, তপস্বিনী, পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী, নামঞ্জুর গল্প।

পৃষ্ঠাসংখ্যা। আখ্যাপত্র ও সূচী [।০]+৭৪৯-১১১৭। প্রকাশকাল মুদ্রিত নাই।

মুদ্রণসংখ্যা ৪২০০। প্র ৭ জানুয়ারি ১৯২৭।

বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছের 'বৈশাখ ১৩৪২' মুদ্রণে নিম্নলিখিত গল্পগুলি নামঞ্জুর গল্পের পর সংযোজিত হয়—

সংস্কার, বলাই, চিত্রকর, চোরাই ধন।

(পুনর্মুদ্রণ বলিয়া বর্ণিত হইলেও ইহা বস্তুত [১৩৩৩ বা ১৯২৭] সালের বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছ তৃতীয় খণ্ডের নবসংস্করণ।

এই সংস্করণের অল্পবিস্তর অশুদ্ধি-সংশোধন-সহ পুনর্মুদ্রণই এখন প্রচলিত। ইহাতে 'পৌষ ১৩১০ হইতে কার্তিক ১৩৪০ সালের মধ্যে প্রকাশিত ছোটো-গল্পগুলি প্রকাশের কালক্রমে সংকলিত'।)

বলাই গল্পটি ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের পাঠপ্রচয় তৃতীয় ভাগে (ফাল্গুন ১৩৩২) গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়।

সহজপাঠ / দ্বিতীয় ভাগ / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / শান্তিনিকেতন প্রেসে / রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / শান্তিনিকেতন, বীরভূম। / মূল্য সাড়ে তিন আনা।

ইহার ১১শ, ১২শ ও ১৩শ পাঠ শিশুপাঠ্য গল্প বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

পৃষ্ঠাসংখ্যা॥ আখ্যাপত্র [৵০]+৫১। [৫২] পৃষ্ঠা সাদা। প্রকাশকাল মুদ্রিত নাই। পরবর্তী মুদ্রণে (মাঘ ১৩৩৭) প্রথম প্রকাশকাল 'বৈশাখ ১৩৩৭' বলিয়া উল্লিখিত।

মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। প্র ১০ মে ১৯৩০।

সে / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় / ২১০ নং কর্নওআলিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ / ২১০ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা / সে / প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৪৪। মূল্য—৩৲ / শান্তিনিকেতন প্রেস; শান্তিনিকেতন (বীরভূম)। / প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য করতলযুগলেষু। উৎসর্গ-কবিতা, পৌষ ১৩৪৩।

এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক চিত্রিত। রচনার সহিত মুদ্রিত রেখাচিত্র ২৬খানি, স্বতন্ত্র মুদ্রিত বহু ও এক-বর্ণ চিত্র কুড়িখানি (?), মলাটে একখানি বহুবর্ণ চিত্র। 'পান্নারাম'-এর ছবিখানি (পৃ ৩৭) ১৯৩২ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর চিত্রতালিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ প্রদর্শনীতে 'সে'র একখানি চিত্রও (১৪৬নং) ছিল।

এই গ্রন্থে চৌদ্দটি গল্প বা অধ্যায় আছে।

"নাৎনীর ফরমাসে কিছুদিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে; নিছক খেলার মানুষ, সত্য মিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন'বছর, আর যে শোনাচ্চে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই সুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমসলা এতই হাল্‌কা ওজনের, যে, নির্বিচারে পুপুও দিল যোগ।... আমি আরম্ভ করে দিলুম, এক যে আছে মানুষ।...এই যে আমাদের এক যে আছে মানুষ এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা দুজনেই জানি, আর কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা...এই যে আমাদের মানুষটি—এ'কে আমরা শুধু বলি "সে"। বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস্ করলে আমরা দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হাসি।" —'সে', ১।

সে ও পান্নারামের আরও কোনো কোনো কাহিনী বর্ণিত আছে নাৎনী পুপুকে লিখিত ২০ আষাঢ় ১৩৩৮ ও ২৩ আশ্বিন ১৩৩৮-এর পত্রে। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র', চতুর্থ খণ্ড।

"নবপর্য্যায় 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের আশ্বিনে কার্তিকে এবং অগ্রহায়ণে এই গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের কোনো কোনো

অংশের পূর্বতন পাঠ প্রকাশিত হয়। রংমশাল পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৪৩ কার্তিক, পৃ ১-৬) যাহা মুদ্রিত হয় প্রায় তাহাই 'সে' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সংকলিত হইয়াছে ; ভূমিকাংশটি (রংমশাল পাঠ) 'সে' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ঈষৎ রূপান্তরিতভাবে গ্রথিত আছে।"—রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, গ্রন্থপরিচয়।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ হাফ-টাইটেল, আখ্যাপত্র ও উৎসর্গ [।৶০]+১৪৮।

মুদ্রণসংখ্যা ২১০০। প্র ১৫ জুলাই ১৯৩৭।

তিন সঙ্গী / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২১০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন / বিশ্বভারতী, ৬/৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা / প্রথম সংস্করণ পৌষ, ১৩৪৭ / মূল্য ১॥০ ও ২৲ টাকা মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় / শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

সূচী ॥ রবিবার, শেষ কথা, ল্যাবরেটরি।

"শেষকথা গল্পটির একটি ভিন্নতর পাঠ দেশ পত্রিকার বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংখ্যায় (৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, পৃ ১৬৫-৭৬) 'ছোটো গল্প' নামে বাহির হইয়াছিল।" রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চবিংশ খণ্ডে 'তিন সঙ্গী'র পরিশিষ্টে উহা মুদ্রিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, সূচী ইত্যাদি [॥০] + ১৫১। ১৫২ পৃষ্ঠা সাদা।

মুদ্রণসংখ্যা ১১০০। প্র ১ জানুয়ারি ১৯৪১।

গল্পসল্প / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২১০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন / বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা / প্রথম সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৪৮ / মূল্য এক টাকা / মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় / শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

উৎসর্গ নন্দিতাকে। উৎসর্গ-কবিতা।

এই গ্রন্থের কয়েক কপি ১ বৈশাখ ১৩৪৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে

চিত্রহীন অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়। পরে অবশিষ্ট কপিগুলিতে নিম্নলিখিত ছবিগুলি যুক্ত হয়—রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক অঙ্কিত মলাট; রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত একখানি রেখাচিত্র, তাহার ঊর্ধ্বাংশে কবির হস্তাক্ষরে 'গল্পসল্প' কথাটি লিখিত আছে, নিম্নে তাঁহার স্বাক্ষর। ১৩৪৮, ২৫ বৈশাখের পূর্বেই এই সচিত্র সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয়। (পরবর্তী কালে শ্রীবিনায়ক মসোজী কর্তৃক শান্তিনিকেতনে ২৪ জুলাই ১৯৪১ তারিখে গৃহীত আলোকচিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার দৌহিত্রী নন্দিতা, যুক্ত হয়)। এই সচিত্র সংস্করণই প্রচলিত।

সূচী ॥ বিজ্ঞানী, পাঁচটা না বাজতেই; রাজার বাড়ি, খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে; বড়ো খবর, পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি; চণ্ডী, যেমন পাজি তেমনি বোকা; রাজরানী, আসিল দিয়াড়ি হাতে; মুন্‌শী, ভীষণ লড়াই তাঁর; ম্যাজিসিয়ান, যেটা যা হয়েই থাকে; পরী, যেটা তোমায় লুকিয়ে জানা আরো-সত্য, আমি যখন ছোটো ছিলুম; ম্যানেজারবাবু, তুমি ভাবো এই যে বোঁটা; বাচস্পতি, যার যত নাম আছে; পান্নালাল, মাটি থেকে গড়া হয়; চন্দনী, দিনখাটুনির শেষে; ধ্বংস, মানুষ সবার বড়ো; ভালোমানুষ, মণিরাম সত্যই স্যায়না; মুক্তকুন্তলা, দাদা হব ছিল বিষম শখ।

প্রত্যেকটি গল্পের সঙ্গে একটি করিয়া কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে—বহু ক্ষেত্রেই একই ভাব হইতে গল্প ও কবিতা রচিত। উপরের সূচীতে যে দুইটি করিয়া রচনার নাম একত্র উল্লিখিত হইয়াছে তাহার প্রথমটি গল্পের শিরোনাম, দ্বিতীয়টি কবিতার প্রথম ছত্র।

অধিকাংশ গল্প ও কবিতা ১৯৪১ জানুয়ারি-মার্চে রচিত, সাময়িক পত্রে প্রকাশের অপেক্ষা করে নাই, মূলতই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভূমিকা' বা প্রবেশক-কবিতাটি ভাইবোন পত্রের ১৩৪৭ বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্রাদি, উৎসর্গ-কবিতা, প্রবেশক-কবিতা, সূচীপত্র [।।৶০] + ৮৪ + 'রচনাকাল'-সূচী [২] ও পূর্বোল্লিখিত চিত্রাবলী।

মুদ্রণসংখ্যা ১১০০। প্র ১০ মে ১৯৪১।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত প্রবেশিকাপাঠ্য সংস্করণ / গল্পগুচ্ছ / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় :

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন / বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা / প্রবেশিকাপাঠ্য সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫০ / মূল্য এক টাকা / মুদ্রাকর—শ্রীত্রিদিবেশ বসু বি. এ. / কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা / ৭৫'০—১০. ১২. ৪৩

বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্রুতপাঠ্যরূপে নির্বাচিত তেরোটি গল্পের সংকলন।

সূচী॥ দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, সম্পত্তিসমর্পণ, মুক্তির উপায়, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, দানপ্রতিদান, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ।

পৃষ্ঠাসংখ্যা॥ আখ্যাপত্র ও সূচী [।০]+১১৬।

মুদ্রণসংখ্যা ৭৫০০। প্র ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪।

দ্রষ্টব্য

এই সূচীতে প্রত্যেক গ্রন্থের বিবরণের প্রারম্ভে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের অনুলিপি প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রতি গ্রন্থের বিবরণের শেষ ছত্রে যে মুদ্রণসংখ্যা ও প্রকাশ-তারিখ (প্র) দেওয়া হইয়াছে তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ হইতে গৃহীত। যে ক্ষেত্রে অন্যত্র গ্রন্থের মূল্য উল্লিখিত নাই সে ক্ষেত্রে, উক্ত শেষ ছত্রে বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ হইতে মূল্যও দেওয়া হইয়াছে। গল্পসপ্তক এলাহাবাদে মুদ্রিত বলিয়া বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ-ভুক্ত হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত পাঁচ খণ্ড গল্পগুচ্ছের যে-সংস্করণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে ঐ প্রকাশালয়ের প্রচারিত গল্পগুচ্ছের প্রথম মুদ্রণ, সে সম্বন্ধে সুনিশ্চয় হওয়া যায় নাই। তবে বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে প্রদত্ত মুদ্রাকর ইত্যাদির বিবরণ হইতে যতদূর জানা যায় তাহাতে, চতুর্থ খণ্ড ব্যতীত, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে উল্লিখিত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের প্রথম মুদ্রণ ও এই পঞ্জীতে উল্লিখিত পুস্তক একই বলিয়া বোধ হয়।

১৯০৮-০৯ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে এগুলিকে দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; ১৩০১ সালে মজুমদার এজেন্সী / লাইব্রেরির প্রকাশিত সংস্করণকে প্রথম সংস্করণ ধরা হইয়াছে। (এই উল্লেখ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস সংস্করণ গল্পগুচ্ছ পঞ্চম খণ্ডের গল্পগুলি নূতন, ১৩০১ সালের গল্পগুচ্ছে সেগুলি ছিল না; সুতরাং মূল গ্রন্থের নামসাম্যের কথা বাদ দিলে, এই খণ্ডটিকে নূতন গ্রন্থ বলা অসংগত নহে।

২। গল্পের সূচী

সাময়িক পত্রে ও রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রকাশের সূচী

ভিখারিণী[১]	ভারতী	শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪
রবীন্দ্র-রচনাবলী। চতুর্দশ খণ্ড		
ঘাটের কথা	ভারতী	কার্তিক ১২৯১
রাজপথের কথা[২]	নবজীবন	অগ্রহায়ণ ১২৯১
মুকুট[৩]	বালক	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
রবীন্দ্র-রচনাবলী। পঞ্চদশ খণ্ড		
দেনাপাওনা[৪]	হিতবাদী	১২৯৮
পোস্টমাস্টার[৪]	হিতবাদী	১২৯৮
গিন্নি[৪, ৫]	হিতবাদী	১২৯৮
রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা[৪]	হিতবাদী	১২৯৮
ব্যবধান[৪]	হিতবাদী	১২৯৮
তারাপ্রসন্নের কীর্তি[৪]	হিতবাদী	১২৯৮

১। রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে এ যাবৎ সংকলিত হয় নাই। সম্প্রতি দেশ পত্রে (২৫ বৈশাখ ১৩৬১) মুদ্রিত হইয়াছে।

২। বিচিত্র প্রবন্ধেরও (১৩১৪) অন্তর্গত হইয়াছিল—'রাজপথ' নামে।

৩। ইহা ছোট উপন্যাস বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে। ইহা ছুটির পড়া [১৯০৯] পুস্তকে গ্রন্থ নিবদ্ধ হয়। 'গল্পগুচ্ছ' বা রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো গল্প-সংগ্রহের অন্তর্গত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপ, মুকুট [১৯০৮]।

৪। "...সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।...সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম.।"

—পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ২৮ ভাদ্র, ১৩১৭। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮ ও 'আত্মপরিচয়'।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী"তে, (শনিবারের চিঠি, চৈত্র ১৩৪৬) লিখিয়াছেন—"হিতবাদীর ফাইল পাই নাই, সুতরাং কোন্ তারিখে কোন্ গল্প প্রকাশিত হয় বলিতে পারিতেছি না। তবে নিম্নলিখিত গল্পগুলি প্রথম ছয় সপ্তাহে বাহির হয়—দেনাপাওনা, ও পোষ্টমাষ্টার, রামকানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, ব্যবধান, গিন্নি।" পোস্টমাস্টার গল্প যে হিতবাদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, চন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্র-রচনাবলী। ষোড়শ খণ্ড

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	সাধনা	অগ্রহায়ণ ১২৯৮
সম্পত্তি সমর্পণ	সাধনা	পৌষ ১২৯৮
দালিয়া[৬]	সাধনা	মাঘ ১২৯৮
কঙ্কাল	সাধনা	ফাল্গুন ১২৯৮
মুক্তির উপায়[৭]	সাধনা	চৈত্র ১২৯৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী। সপ্তদশ খণ্ড

ত্যাগ	সাধনা	বৈশাখ ১২৯৯
একরাত্রি	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
একটা আষাঢ়ে গল্প[৮]	সাধনা	আষাঢ় ১১৯৯
জীবিত ও মৃত	সাধনা	শ্রাবণ ১২৯৯
স্বর্ণমৃগ	সাধনা	ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯
রীতিমতো নভেল	সাধনা	ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯
জয়পরাজয়	সাধনা	কার্তিক ১২৯৯
কাবুলিওয়ালা	সাধনা	অগ্রহায়ণ ১২৯৯
ছুটি	সাধনা	পৌষ ১২৯৯
সুভা	সাধনা	মাঘ ১২৯৯
মহামায়া	সাধনা	ফাল্গুন ১২৯৯
দানপ্রতিদান	সাধনা	চৈত্র ১২৯৯

রবীন্দ্র-রচনাবলী। অষ্টাদশ খণ্ড

সম্পাদক	সাধনা	বৈশাখ ১৩০০

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক পত্রে (২৫ পৌষ ১২৯৮। বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও ছিন্নপত্রে (২৯ জুন ১৮৯২ তারিখের পত্র) এই গল্পটির হিতবাদীতে প্রকাশের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে ঐ কয়টি গল্পের ১২৯৮ তারিখ দেওয়া হইয়াছে। গল্প কয়টি উক্ত গল্পগুচ্ছে (এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীতে যে ক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে, উহার তালিকাও সেই ক্রমেই মুদ্রিত হইল।

হিতবাদী প্রকাশের তারিখ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাময়িক পত্র দ্বিতীয় খণ্ডে (আষাঢ় ১৩৫৯) দিয়াছেন ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮, ৩০ মে ১৮৯১।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস উক্ত রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জীতে আরও অনুমান করিয়াছেন যে, "খাতা গল্পটিও বোধ হয় হিতবাদীতে সপ্তম সপ্তাহে বাহির হয়।"

মধ্যবর্তিনী	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
অসম্ভব কথা [৯]	সাধনা	আষাঢ় ১৩০০
শাস্তি	সাধনা	শ্রাবণ ১৩০০
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	সাধনা	ভাদ্র ১৩০০
সমাপ্তি	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০
সমস্যাপূরণ	সাধনা	অগ্রহায়ণ ১৩০০
খাতা [১০]		

রবীন্দ্র-রচনাবলী। উনবিংশ খণ্ড

অনধিকার প্রবেশ [১১]	সাধনা	শ্রাবণ ১৩০১
মেঘ ও রৌদ্র [১২]	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১
প্রায়শ্চিত্ত	সাধনা	অগ্রহায়ণ ১৩০১
বিচারক	সাধনা	পৌষ ১৩০১
নিশীথে	সাধনা	মাঘ ১৩০১
আপদ	সাধনা	ফাল্গুন ১৩০১
দিদি	সাধনা	চৈত্র ১৩০১

খাতা রবীন্দ্রনাথের 'ছোট গল্প' (১৩০০) পুস্তকে প্রথমে গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়। হিতবাদীতে প্রকাশ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকায়, গ্রন্থে প্রকাশের সময়ানুযায়ী তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

৫ 'ছোট গল্প' (১৩০০) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও, ১৩০৭ সালে প্রকাশিত গল্প বা গল্প-গুচ্ছ গ্রন্থে গিন্নি বাদ পড়ে; হিতবাদির উপহার রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীতে (১৩১১) পুনরায় মুদ্রিত হয়। ১৯০৮-০৯ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত (পাঁচ ভাগ) গল্পগুচ্ছে গল্পটি বর্জিত হয়; বিশ্বভারতী-সংস্করণ গল্পগুচ্ছে পুনরায় মুদ্রিত হয়।

এইরূপ আরো কোনো কোনো গল্প বিভিন্ন গ্রন্থে বর্জিত, পরে গ্রন্থান্তরে পুনর্গৃহীত হয়।

৬ "রাজর্ষি উপন্যাসের শেষ ভাগের সঙ্গে দালিয়ার গল্পাংশ" যোগ করিয়া একটি নাটকের রবীন্দ্রনাথ-কৃত পরিকল্পনা (ছায়াচিত্রের জন্য অভিপ্রেত?), শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ ১৩৫০ সংখ্যায় 'অরচিত নাটকের পরিকল্পনা' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

৭ রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপ, 'মুক্তির উপায়' (অলকা, আশ্বিন ১৩৪৫; গ্রন্থাকারে প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৫৫)

৮ রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপ, 'তাসের দেশ' (ভাদ্র ১৩৪০)।

৯ বিচিত্র প্রবন্ধেরও (১৩১৪) অন্তর্গত হইয়াছিল। সাধনায় নাম 'অসম্ভব গল্প'।

১০ পাদটীকা ৪ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্র-রচনাবলী। বিংশ খণ্ড

মানভঞ্জন	সাধনা	বৈশাখ ১৩০২
ঠাকুরদা	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
প্রতিহিংসা	সাধনা	আষাঢ় ১৩০২
ক্ষুধিত পাষাণ	সাধনা	শ্রাবণ ১৩০২
অতিথি	সাধনা	ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২
ইচ্ছাপূরণ	সখা ও সাথী[১৩]	আশ্বিন ১৩০২

রবীন্দ্র-রচনাবলী। একবিংশ খণ্ড

দুরাশা	ভারতী[১৪]	বৈশাখ ১৩০৫
পুত্রযজ্ঞ[১৫]	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
ডিটেকটিভ	ভারতী	আষাঢ় ১৩০৫

১১ সমসাময়িক একটি ঘটনা—দেশী শ্মশানঘাটে ভারতপ্রেমিক হ্যামারগ্রেন-সাহেবের সৎকার ও দেশীয় সংবাদপত্রে তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা—হইতে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের প্রেরণা পাইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথের "বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য" প্রবন্ধ. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। সাধনা পত্রে একই সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধ ও অনধিকার প্রবেশ গল্প পর পর মুদ্রিত হইয়াছিল।

১২ এই গল্পে উল্লিখিত বিদেশীয় কর্তৃক এ দেশীয় লোকের উৎপীড়নের প্রসঙ্গ—ম্যানেজার সাহেব কর্তৃক নৌকার পাল লক্ষ্য করিয়া গুলী করা ও পুলিস-সাহেব কর্তৃক জেলেদের জাল কাটিয়া ফেলা—রবীন্দ্রনাথের নিজ-অভিজ্ঞতা-প্রসূত, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন (রবীন্দ্র-জীবনী ১, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃ ৩০৪)।

১৩ "সখা ও সাথীর কর্তৃপক্ষেরা দিনকতক তাঁহাদের কাগজে একটা গল্প দিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন।…অবশেষে আমি একটি নূতন ছোট গল্প লিখিয়া সম্পাদকীয় perturbed spiritকে শান্তি দান করিয়াছিলাম।… ৬ চৈত্র, ১৩০২।"

—রবীন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪৯।

গল্পটি বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছে প্রথম রবীন্দ্রগ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত শিশুদের বার্ষিক পত্র 'পার্ব্বণী'তে (১৩২৫) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৪ ১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদক ছিলেন।

১৫ পুত্রযজ্ঞ গল্পটির লেখকের নাম ভারতীর সূচীপত্রে ছিল 'শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর'। প্রথম সংস্করণ বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৩৩) ইহা রবীন্দ্রগ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গল্পটি গ্রহণকালে এ সম্বন্ধে সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে পত্রোত্তরে লেখেন—

"পুত্রযজ্ঞ গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লিখিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমি কেবলমাত্র

অধ্যাপক	ভারতী	ভাদ্র	১৩০৫
রাজটিকা	ভারতী	আশ্বিন	১৩০৫
মণিহারা	ভারতী	অগ্রহায়ণ	১৩০৫
দৃষ্টিদান	ভারতী	পৌষ	১৩০৫

রবীন্দ্র-রচনাবলী। দ্বাবিংশ খণ্ড

সদর ও অন্দর	প্রদীপ	আষাঢ়	১৩০৭
উদ্ধার	ভারতী	শ্রাবণ	১৩০৭
দুর্বুদ্ধি	ভারতী	ভাদ্র	১৩০৭
ফেল	ভারতী	আশ্বিন	১৩০৭
শুভদৃষ্টি	প্রদীপ	আশ্বিন	১৩০৭
যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ[১৬]			
উলুখড়ের বিপদ[১৬]			
প্রতিবেশিনী[১৬]			
নষ্টনীড়	ভারতী	বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ	১৩০৮
দর্পহরণ	বঙ্গদর্শন	ফাল্গুন	১৩০৯
মাল্যদান	বঙ্গদর্শন	চৈত্র	১৩০৯
কর্মফল[১৭]			
মাস্টারমশায়	প্রবাসী	আষাঢ়, শ্রাবণ	১৩১৪
গুপ্তধন	বঙ্গভাষা	কার্তিক	১৩১৪

উহার আখ্যানবস্তুটি আমার কাঁচা ভাষায় লিখিয়া খামখেয়ালি সভায় পাঠের জন্য তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম, তিনি উহা দেখিয়া তাহার আমূল সংশোধন করিয়া ও নিজের অতুলনীয় ভাষায় লিখিয়া সেই সভায় আমার লিখিত বলিয়া পাঠ করেন; বোধ হয় সেই কারণে গল্পটি আমার লিখিত বলিয়া সেই সময় উক্ত মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, পরে পুনর্মুদ্রণের সময় গল্পগুচ্ছে সে ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত ও সুখী হইলাম। ২১ ফাল্গুন ১৩৫১।"

অপিচ দ্রষ্টব্য শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্র, তথ্যপঞ্জী, পৃ ২৯-৩০।

১৬ সাময়িক পত্রে প্রকাশের সন্ধান এ যাবৎ পাই নাই। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ গল্পগুচ্ছ (মজুমদার), ১৩০৭। এই প্রসঙ্গে অনুরোধ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত প্রভাত (প্র ১৩০৭) পত্রের ফাইল কাহারও নিকট থাকিলে তাহা দেখিতে দিলে অনুগৃহীত হইব।

১৭ রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপ, শোধবোধ [১৯২৬]। দ্রষ্টব্য, কর্মফল গ্রন্থের বিবরণ, তথ্যপঞ্জী, পৃ ৪।

রাসমণির ছেলে	ভারতী	আশ্বিন ১৩১৮
পণরক্ষা	ভারতী	পৌষ ১৩১৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী। ত্রয়োবিংশ খণ্ড

হালদারগোষ্ঠী	সবুজপত্র	বৈশাখ ১৩২১
হৈমন্তী	সবুজপত্র	জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
বোষ্টমী	সবুজপত্র	আষাঢ় ১৩২১
স্ত্রীর পত্র[১৮]	সবুজপত্র	শ্রাবণ ১৩২১
ভাইফোঁটা	সবুজপত্র	ভাদ্র ১৩২১
শেষের রাত্রি[১৯]	সবুজপত্র	আশ্বিন ১৩২১
অপরিচিতা	সবুজপত্র	কার্তিক ১৩২১
তপস্বিনী	সবুজপত্র	জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪
পয়লা নম্বর[২০]	সবুজপত্র	আষাঢ় ১৩২৪
পাত্র ও পাত্রী	সবুজপত্র	পৌষ ১৩২৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী। চতুর্বিংশ খণ্ড

নামঞ্জুর গল্প	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ ১৩৩২
সংস্কার	প্রবাসী	আষাঢ় ১৩৩৫
বলাই[২১]	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ ১৩৩৫
চিত্রকর[২১]	প্রবাসী	কার্তিক ১৩৩৬
চোরাই ধন	ছোট গল্প	১১ কার্তিক ১৩৪০

রবীন্দ্র-রচনাবলী। পঞ্চবিংশ খণ্ড

রবিবার	আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ আশ্বিন ১৩৪৬ শারদীয় সংখ্যা	
শেষকথা[২২]	শনিবারের চিঠি	ফাল্গুন ১৩৪৬

১৮ এই গল্প প্রকাশিত হইলে সাময়িক পত্রে বিশেষ আন্দোলনের কারণ হইয়াছিল।

১৯ রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপ, গৃহপ্রবেশ (১৩৩২)।

২০ পত্রাকারে লিখিত স্ত্রীর পত্র, এবং প্রধানত নাট্যোচিত কথোপকথনে লিখিত কর্মফল প্রভৃতি বাদ দিলে এইটি 'চলিত' ভাষায় প্রথম প্রকাশিত গল্প। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সকল গল্পই পুরাদস্তুর চলিত ভাষায় লিখিত।

২১ শান্তিনিকেতনে বর্ষা-উৎসব উপলক্ষে রচিত ও রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পঠিত।

২২ এই গল্পটির অন্য একটি পাঠ দেশ পত্রিকায় 'বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংখ্যা'র (৩০ অগ্রহায়ণ

ল্যাবরেটরি	আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা	১৫ আশ্বিন ১৩৪৭

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত

বদনাম	প্রবাসী	আষাঢ় ১৩৪৮

রচনাকাল ১৯৪১ মে ১৫-২২

প্রগতি সংহার	আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা	৩রা আশ্বিন ১৩৪৮

রচনাকাল ১৯৪১ জুন ১১-২১। পূর্বনাম কাপুরুষ

শেষ পুরস্কার	বিশ্বভারতী পত্রিকা	শ্রাবণ ১৩৪৯

রচনাকাল ১৯৪১ মে ৫-৬

"এটা ঠিক গল্প নয়, গল্পের কাঠামো মাত্র। রবীন্দ্রনাথের শেষ অসুখের সময় এটি কল্পিত হয়েছিল। এটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।"—সম্পাদক

মুসলমানীর গল্প	ঋতুপত্র	বর্ষা সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬২

রচনাকাল ১৯৪১ জুন ২৪-২৫

"এই লেখাটি পূর্ণাঙ্গ ছোট গল্প নয়। গল্পের খসড়া মাত্র। এটিই তাঁর শেষ গল্প রচনার চেষ্টা।..."—সম্পাদক

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সদনের দপ্তরে ইহা দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত অবস্থায় রক্ষিত ছিল।[২৩]

গল্পের প্লট

হেমেন্দ্রকুমার রায় যাঁদের দেখেছি গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"তাঁর আরো একটি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।...সংলাপের আসরে ব'সে অনুরুদ্ধ হলে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখেই নূতন গল্প ও উপন্যাসের 'প্লট' তৈরি করে দিতে পারতেন।"[২৪] 'সংলাপের আসরে' 'মুখে মুখে...তৈরি'

১৩৪৬) 'ছোটো গল্প' আখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চবিংশ খণ্ডে তিন সঙ্গী গ্রন্থের পরিশিষ্টে উহা মুদ্রিত হইয়াছে।

২৩ শেষ অসুস্থার সময় মুখে-মুখে বলিয়া লেখানো গল্পগুলি স্বভাবতই কবি বারংবার সংশোধন করিবার প্রযত্ন করিতেন। (এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, শ্রীসুধীরচন্দ্র কর, কবি কথা, পৃ ৬০)।

কয়েকটি গল্পের বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (প্রথম সংস্করণ) গ্রন্থের ১৮৫-৮৮ পৃষ্ঠায় এইরূপ 'একটা সত্যি গল্প' বিবৃত আছে।

'মুখে-মুখে···তৈরি' একটি গল্পের বিবরণ দিয়াছেন শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্রী শ্রীমতী মমতা দাশগুপ্ত, ১৩৫৯ সালের ২৪ শ্রাবণ সংখ্যা 'দেশ' পত্রে "আনন্দস্মৃতি" প্রবন্ধে—

"...শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ছেড়ে আসবার অনেক দিন পরে আর একটি দিনের কথাও আজ মনে পড়ছে। ১৯৩৫-এ গুরুদেব একবার লক্ষ্ণৌ আসেন।···

"আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার কেমরণ রোডে একটি ছোট বাড়িতে থাকতাম। সেই বাড়ির সামনেই মস্ত একটা তেঁতুল গাছ। আমার সেই ছোট বাড়িতেই একদিন তাঁর পদধূলি পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কতক্ষণই বা ছিলেন তিনি, কিন্তু সেই বাড়ির কথা তিনি কখনো ভোলেন নি।

"১৯৩৬-এ আমি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম। তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ও আমার মা গুরুদেবকে প্রণাম করতে গিয়েছি। আমরা তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আমাদের মোড়ায় বসতে বললেন। আমরা বসতেই তিনি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে গল্প বলতে শুরু করলেন।

"সুদূর পশ্চিমের একটি শহরে ছোট্ট একটি বাড়ি। সামনেই প্রকাণ্ড একটা তেঁতুল গাছ।

"সেদিন শীতের সন্ধ্যা বাইরে বৃষ্টি চলছে। গৃহকর্তা অধ্যাপক গেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে এলাহাবাদে।

"তা সত্ত্বেও গৃহিণী অত্যন্ত ব্যস্ত। বাদলা সন্ধ্যা, বন্ধুরা আসবেন। তাদের জন্য

এই গল্পগুলির যে রচনাকাল উল্লিখিত হইল তাহাতে প্রথম রচনা ও শেষ সংশোধনের তারিখ সংকলন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

২৪ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় আরো লিখিয়াছেন—"নিজে বেশী উপন্যাস লেখেন নি, কিন্তু নূতন উপন্যাসের 'প্লট' ছিল যেন তাঁর হাত-ধরা! বন্ধুবর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐভাবে রবীন্দ্রনাথের মুখে মুখে সৃষ্ট কয়েকটি আখ্যানবস্তুর সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।"—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্রোতের ফুল, দুই তার, হেরফের ও ধোঁকার টাটি উপন্যাসের 'কাঠামো', 'আভাস' বা 'মূল ধারা' রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। প্রথম তিনখানি গ্রন্থে সে কথা স্বীকৃত আছে, চতুর্থখানির কথা 'রবি-রশ্মি' পশ্চিম ভাগের পরিশিষ্টে উল্লিখিত।

নানারকম সাঁতলাভাজা, চিড়েভাজা, কচুরি তৈরি করে তিনি তাদের অপেক্ষায় আছেন এমন সময়ে বাইরের দরজায় কে জোরে আঘাত করল। গৃহিণী দরজা খুলে দেখেন সেই দুর্যোগে অন্ধকারে একটি তেইশ চব্বিশ বছরের সুন্দর ছেলে বৃষ্টিতে ভিজে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গৃহিণীকে দেখেই ছেলেটি বলে উঠল, 'আজকের রাতটার জন্য যদি একটু আপনার বাড়িতে স্থান পাই। আমি আজ অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত।' দিনকাল ভাল না একথা শুনেই নানারকম বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও গৃহিণী তাকে থাকতে দিলেন। তাকে খাইয়ে দাইয়ে কর্তার একটা এণ্ডির চাদরও গায়ে দেবার জন্য দিলেন। ছেলেটি শীতে কাঁপছিল।

"পরদিন সকালে তো অধ্যাপক এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন। নিজের বাড়িতে পুলিসের সমাবেশ দেখে অবাক। ব্যাপার কি? পুলিসকর্তা বললেন, 'দেখুন আপনার স্ত্রীটি তো কম নন। তিনি একজন এনার্কিস্ট পলাতক ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তাঁরও যোগ আছে এতে।' অধ্যাপক অত্যন্ত বিব্রত হয়ে উঠলেন। তিনি সমানেই বলে যেতে লাগলেন, 'না, না, আমার স্ত্রী অতিশয় ভালমানুষ, তিনি কি ক'রে এসবে যোগ দেবেন?'

"তবুও ছাড়াছাড়ি নেই। অধ্যাপককে তখুনি আদালতে যেতে হল। সেখানে গিয়ে দেখলেন সেই ছেলেটির গায়ে তাঁরই নিজের এণ্ডির চাদর। দেখে তো তাঁর চক্ষুস্থির। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই তো আমার এণ্ডির চাদর।' ছেলেটিকে পুলিস হাজতে নিয়ে চলে গেল।

"গুরুদেব এই পর্যন্ত বলে আমার দিকে তাকিয়ে খুব হাসতে লাগলেন। আমায় বললেন, 'কিরে, এ মেয়েটিকে চিনতে পারছিস?'

"গুরুদেব যখন গল্পটি আরম্ভ করেছিলেন তখন ধরতেই পারি নি যে তিনি কোথাকার কথা বলছেন।

"এরই দুতিনদিন পর আবার এক সন্ধ্যায় 'শ্যামলী'তে গিয়েছি। যাওয়ামাত্রেই হঠাৎ আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'দেখ লাবি, চাদরটা পাওয়া গেছে। ছেলেটি কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়, চাদরটা জেল থেকেই পার্সেল করে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

"লিখ্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। তিনি যখন গল্পটি বলছিলেন, তখন তাঁর বলার ভঙ্গী আর ভাষার মাধুর্য অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তাঁর বলার ভঙ্গীটি কানে আজও ভেসে আসছে।"

"একটি প্লট পাঠিয়েছিলেন পত্রে পুরে সুবিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক 'বনফুল' ওরফে শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে।"[২৫] "অনেক প্লট শেষ পর্যন্ত গল্প-কাব্য ও পদ্য-কথিকায় সংক্ষেপ আকার [২৬] নিয়ে রয়েছে শেষের কাব্যগুলোতে।"

'লেখা হয়ে ওঠে নি' এমন একটি গল্পের খসড়া শ্রীরানী চন্দের নিকট বিবৃত করেন ১৯৪১-এর ১৭ মে তারিখে। শ্রীরানী চন্দের আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ পৃ ১০৪-০৭) উহা লিপিবদ্ধ আছে। "গল্পটা আমার মনে এসেছিল যখন সাউথ আমেরিকায় ছিলুম।"

শান্তিনিকেতনের পূর্বতন অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"আমি পণ্ডিত মহাশয় ও সতীশকে গুটিকয়েক গল্পের প্লট দিয়া গল্প লিখাইয়াছি।"—'স্মৃতি', মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রসংগ্রহ।

...রবীন্দ্রনাথ "যৌতুক" গল্পের প্লটটি শরৎকুমারীকে দেন এবং উহা লইয়া তাঁহাকে একটি গল্প রচনা করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ-মত পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই শরৎকুমারী "যৌতুক" গল্পটি লিখিয়া ফেলেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ ইহা জানিতেন না; কারণ পরবর্তীকালে তিনি এই প্লটটি আবার চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন এবং তিনি "চাঁদির জুতা" গল্পটি লেখেন। গল্পটি চারুবাবুর 'বরণডালা' নামক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

—শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী,

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদকীয় ভূমিকা।

"দেবী" গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমায় দান করিয়াছিলেন—এ কথাটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করি নাই। এখন করিলাম।

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "নব-কথা", দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁহার "প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়" গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১৩৩৪ মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত শ্রীঅমিয়ভূষণ বসুর "হট্টমালার

---

২৫ শ্রীসুধীরচন্দ্র কর, কবি-কথা, পৃ ৪৪।

২৬ এ প্রসঙ্গে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, সানাই-এর পরিচয় ও বাসাবদল কবিতায় 'অবিচ্ছিন্ন আদিপাঠ', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৮৩-৮৬।

দেশে" গল্পটি "পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শ্রুত গল্পের অস্ফুট স্মৃতি অবলম্বনে" রচিত।

গল্প উপন্যাসের প্লট বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার কথাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন (১৩২১ ?) এইখানে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে—"তোমরা সব বড় পরে জন্মেছ। বছর কুড়ি আগে যদি জন্মাতে তাহলে তোমাদের আমি দেদার প্লট দিতে পারতাম। তখন আমার মনে হতো আমি দুহাতে প্লট বিলিয়ে হরির লুট দিতে পারি।"[২৭]

সৎপাত্র

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন ১৩০৯ পৌষ সংখ্যায় সৎপাত্র নামে স্বাক্ষর-বিহীন একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্ষসূচীতেও লেখকের নাম ছিল না। সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে রচনাটি সম্পাদকের বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে, যদিও রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনেই তাহার ব্যতিক্রম আছে (দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "লেখন", প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৫ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ডে লেখন পুস্তকের গ্রন্থপরিচয়ে পুনর্মুদ্রিত। অপিচ (দ্রষ্টব্য, শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩ (১৩৫৩), পৃ ১১৮, পাদটীকা) ।

শ্রীসুকুমার সেন এই গল্পটি প্রসঙ্গে তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ডে (১৩৫৩ লিখিয়াছেন—স্বসম্পাদিত নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট-গল্পের মধ্যে প্রথম হইতেছে 'সৎপাত্র'।... কেন বলিতে পারি না, সৎপাত্র গল্পগুচ্ছে আদৌ সংগৃহীত হয় নাই।"

এ বিষয়ে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে যে পত্র লেখেন তাহা বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫ হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল—

"সৎপাত্র গল্পটি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য জানাচ্ছি।

"ইণ্ডিয়ান প্রেসের হাত থেকে কবির বই প্রকাশ করার ব্যবস্থা যখন আমরা বিশ্বভারতী থেকে কিনে নিলাম তার কিছুদিন পরে গল্পগুচ্ছের একটি বিশ্বভারতী-সংস্করণ ছাপানো স্থির হোলো। গল্পের তালিকা তৈরী করতে গিয়ে দেখি যে কতকগুলি গল্প বাদ পড়েছে। সেইগুলি কবির কাছে

২৭ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "রবি-রশ্মি" পশ্চিম ভাগে [প্রথম সংস্করণ], পৃ ৩৫৮।

নিয়ে গেলাম—তার মধ্যে পুত্রযজ্ঞ আর সৎপাত্র এই দুটি গল্পও ছিল। গল্প পড়ে আমার মনে হয়েছিল, যে, সম্ভবতঃ কবির লেখা।

"পুত্রযজ্ঞ ভারতীতে প্রথম ছাপা হয় শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে। কিন্তু আসলে এটি কবির লেখা তাই কবি এই গল্পটিকে গল্পগুচ্ছের মধ্যে দিতে বললেন। এ সম্বন্ধে সমরবাবুর নিজের উক্তি ছাপা হয়েছে—দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃ ৪৩৮। শুধু একটা কথা মনে পড়ছে যে, কবির কাছে শুনেছিলাম, ঐ গল্পের আখ্যানভাগটিও কবি নিজে প্রথমে সমরবাবুকে মুখে মুখে বলে দিয়েছিলেন।

"তার পরে কথা হোলো 'সৎপাত্র' সম্বন্ধে। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কবি বললেন—'সৎপাত্র গল্পটা ঠিক আমার বলা চলে না। আমি ওটাতে কিছু কলম চালিয়েছি বটে, কিন্তু ওটা আসলে বেলা[২৮] নিজেই লিখেছিল। ওর আখ্যানভাগ কাঠামো সব ওর নিজের। ওর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু লিখত না। আমার কাছে খাতাটা দিল, বলল, একটু দেখে দাও। আমি লেখাটা কিছু বদলিয়ে দিয়েছিলুম—কিন্তু আসলে গল্পটা ওরই লেখা। ওটা আমার লেখা বলে নেওয়া চলবে না। ওটা বাদ দাও।'

"কবির স্পষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী 'সৎপাত্র' গল্পটি কবির রচনাবলীর অন্তর্গত করা হয় নি।"

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের স্বকৃত নাট্যরূপ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত কোনো কোনো ছোটগল্প অবলম্বনে পরবর্তী কালে নাট্যরচনা করিয়াছিলেন—তাহার একটি তালিকা মুদ্রিত হইল।

ছোট গল্প	নাটক	নাটক প্রকাশের তারিখ
মুকুট	মুকুট	[১৩১৫]
মুক্তির উপায়	মুক্তির উপায়	১৩৫৫
একটা আষাঢ়ে গল্প	তাসের দেশ	১৩৪০
কর্মফল	শোধবোধ	[১৩৩৩]
শেষের রাত্রি	গৃহপ্রবেশ	১৩৩২

২৮ কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী। ইঁহার রচিত আরও কতকগুলি গল্প 'ভারতী' 'সবুজপত্র' প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়।

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী এই গল্পটি সংকলয়িতার দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন।

৩। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থে গল্পের প্রকাশ-সূচী

গল্পগুচ্ছ, মজুমদার = মজুমদার এজেন্সী / লাইব্রেরী প্রকাশিত গল্পগুচ্ছ ১-২, ১৩০৭ গল্পগুচ্ছ, ইণ্ডিয়ান = ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হউস প্রকাশিত গল্পগুচ্ছ ১-৫, ১৩১৫, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী = বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছের (১-৩, ১৩৩৩) সর্বশেষ সংস্করণ রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী = হিতবাদীর উপহার রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩১১
রবীন্দ্র-রচনাবলী বিশ্বভারতীর, ১৩৪৬-৫৫

ঘাটের কথা

ছোট গল্প
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪

রাজপথের কথা

ছোট গল্প
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
বিচিত্র প্রবন্ধ[১]
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪

মুকুট

ছুটির পড়া
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪

দেনাপাওনা

ছোট গল্প
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫

পোস্টমাস্টার

ছোট গল্প
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫

গিন্নি

ছোট গল্প
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫

রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা

ছোট গল্প
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার

১ 'রাজপথ' নামে

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
আটটি গল্প[২]
পাঠসঞ্চয় ২
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
পাঠপ্রচয় তৃতীয়[২]
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫

ব্যবধান

ছোট গল্প
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫

তারাপ্রসন্নের কীর্তি

ছোট গল্প
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

বিচিত্র গল্প ১
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার[৩]
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান[৩]
আটটি গল্প[৩]
বিচিত্র পাঠ[৩]
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
পাঠপ্রচয় চতুর্থ[৩]
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬

সম্পত্তি-সমর্পণ

বিচিত্র গল্প[১]
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
পাঠপ্রচয় ৪
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬

দালিয়া

বিচিত্র গল্প ২
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬

কঙ্কাল

বিচিত্র গল্প ১
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬

---
২ 'সাক্ষী' নামে
৩ 'খোকাবাবু' নামে

মুক্তির উপায়

বিচিত্র গল্প ২
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র রচনাবলী ১৬

ত্যাগ

বিচিত্র গল্প ১
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭

একরাত্রি

ছোট গল্প
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭

একটা আষাঢ়ে গল্প

বিচিত্র গল্প ২
গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭

জীবিত ও মৃত

বিচিত্র গল্প ২
গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭

স্বর্ণমৃগ

বিচিত্র গল্প ১
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
আটটি গল্প
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭

রীতিমতো নভেল

ছোট গল্প
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭

জয়পরাজয়

বিচিত্র গল্প ১
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭

কাবুলিওয়ালা

ছোট গল্প
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
আটটি গল্প
পাঠসঞ্চয়
বিচিত্র পাঠ
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
পাঠপ্রচয় ৩
ববীন্দ্র-রচনাবলী ১৭

ছুটি

ছোট গল্প
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭

সুভা

বিচিত্র গল্প ২
গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭

মহামায়া

বিচিত্র গল্প ২
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭

দান-প্রতিদান

ছোটগল্প
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
আটটি গল্প
পাঠসঞ্চয়
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
পাঠপ্রচয় ৩
রবীন্দ্র-রচনাচলী ১৭

সম্পাদক

ছোট গল্প
গল্পগুচ্ছ ১ মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮

মধ্যবর্তিনী

কথা-চতুষ্টয়
গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী

অসম্ভব কথা

বিচিত্র গল্প ১
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
বিচিত্র প্রবন্ধ
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮

শাস্তি

কথা-চতুষ্টয়
গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৩। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প

বিচিত্র গল্প ২
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮

সমাপ্তি

কথা-চতুষ্টয়
গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৩। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮

সমস্যাপূরণ

ছোট গল্প
গল্পগুচ্ছ ২ মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮

খাতা

ছোট গল্প
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ১। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮

অনধিকার প্রবেশ

বিচিত্র গল্প ২
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
আটটি গল্প
পাঠসঞ্চয়
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
পাঠপ্রচয় ৪
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯

মেঘ ও রৌদ্র

কথা-চতুষ্টয়
গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান

গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯

প্রায়শ্চিত্ত

গল্প-দশক
গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯

বিচারক

গল্প-দশক
গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯

নিশীথে

গল্প দশক
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯

আপদ

গল্প-দশক
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯

দিদি

গল্প-দশক
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯

মানভঞ্জন

গল্প-দশক
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০

ঠাকুরদা

গল্প-দশক
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০

প্রতিহিংসা

গল্প-দশক
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র রচনাবলী ২০

ক্ষুধিত পাষাণ

গল্প-দশক
গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০

অতিথি

গল্প-দশক
গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০

ইচ্ছাপূরণ

পার্বণী ১৩২৫[৪]
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০

দুরাশা

গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৩। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১

পুত্রযজ্ঞ

গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১

ডিটেকটিভ

গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৩। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১

অধ্যাপক

গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৩। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র রচনাবলী ২১

রাজটিকা

গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৩। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১

---

৪ ইহা রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন নহে, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সংকলিত বিভিন্ন গ্রন্থকারের রচনা সম্বলিত বার্ষিকী

মণিহারা

গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৩। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র রচনাবলী ২১

দৃষ্টিদান

গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৩। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১

সদর ও অন্দর

গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

উদ্ধার

গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ২। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

দুর্বুদ্ধি

গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

ফেল

গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র রচনাবলী ২২

শুভদৃষ্টি

গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ

গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্প-গুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

উলুখড়ের বিপদ

গল্পগুচ্ছ ২। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ১। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

প্রতিবেশিনী

গল্পগুচ্ছ ১। মজুমদার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী

গল্পগুচ্ছ ৪। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

নষ্টনীড়

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী
গল্পগুচ্ছ ৫। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

দর্পহরণ

গল্প চারিটি
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র রচনাবলী ২২

মাল্যদান

গল্প চারিটি
গল্পগুচ্ছ ২। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

কর্মফল

কর্মফল, স্বতন্ত্র পুস্তক
গল্পগুচ্ছ ৫। ইণ্ডিয়ান
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

মাস্টারমশায়

গল্পগুচ্ছ ৫। ইণ্ডিয়ান
আটটি গল্প
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

গুপ্তধন

গল্পগুচ্ছ ৫। ইণ্ডিয়ান
আটটি গল্প
পাঠসঞ্চয়
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

রাসমণির ছেলে

গল্প চারিটি
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

পণরক্ষা

গল্প চারিটি
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২

হালদারগোষ্ঠী

গল্পসপ্তক
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩

হৈমন্তী

গল্পসপ্তক
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩

বোষ্টমী

গল্পসপ্তক
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র রচনাবলী ২৩

স্ত্রীর পত্র

গল্পসপ্তক
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩

ভাইফোঁটা

গল্পসপ্তক
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩

শেষের রাত্রি

গল্পসপ্তক
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩

অপরিচিতা

গল্পসপ্তক
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩

তপস্বিনী

পয়লা নম্বর
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩

পয়লা নম্বর

পয়লা নম্বর
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩

পাত্র ও পাত্রী

গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩

নামঞ্জুর গল্প

গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪

সংস্কার

গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪

বলাই

পাঠপ্রচয় ৩
গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪

চিত্রকর

গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪

চোরাই ধন

গল্পগুচ্ছ ৩। বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪

রবিবার

তিন সঙ্গী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫

শেষ কথা

তিন সঙ্গী
রবীন্দ্র রচনাবলী ২৫

ল্যাবরেটরি

তিন সঙ্গী
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫

সাময়িক পত্রে প্রকাশের পর বহু ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন গল্পে পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন। এইসকল পাঠভেদের আলোচনার পথ যাহাতে সুগম হয়, এই অভিপ্রায়ে গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে তাঁহার কোন্ কোন্ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সূচী সংকলিত হইল—সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচীও স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রবেশিকাপাঠ্য সংস্করণ গল্পগুচ্ছ এই তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই।

…আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক এক সময় মনে হয় আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।…মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজ্‌দের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায়।…সাজাদপুর ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩

—রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র, ছিন্নপত্র

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট্‌ এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন যা হোক একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা[১] নাম্নী উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবে মাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল—তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের

১ দ্রষ্টব্য "মেঘ ও রৌদ্র" গল্প

জন্য অপেক্ষা করতে হল। তা হোক তবু সে মনের মধ্যে আছে।···আমি ভাবলুম এই তো আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে···নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি।···শিলাইদা, ২৭ জুন ১৮৯৪

· —রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র, ছিন্নপত্র

···ছোট গল্প রচনার প্রসঙ্গে রবিবাবু বলিলেন··"আমি প্রথমে কেবল কবিতাই লিখতুম গল্পে টল্পে বড় হাত দিই নাই। মাঝে একদিন বাবা ডেকে বললেন—'তোমাকে জমিদারীর বিষয়কর্ম দেখতে হবে।' আমি তো অবাক; আমি কবি মানুষ, পদ্যটদ্য লিখি, আমি এ সবের কি বুঝি? কিন্তু বাবা বললেন —'তা হবে না; তোমাকে এ কাজ করতে হবে।' কি করি? বাবার হুকুম, কাজেই বেরতে হ'ল। এই জমিদারী দেখা উপলক্ষে নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয় এবং এই থেকেই আমার গল্পলেখারও শুরু হয়।"

এই কথা প্রসঙ্গে রবিবাবু তাঁহার দুই-একটি গল্প রচনার ক্ষুদ্র ইতিহাস দিলেন। কোনা-না-কোনো বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব চিত্র হইতে তাঁহার অনেক গল্পেরই উৎপত্তি।—[২মে ১৯০৯]

রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,
"শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ", সুপ্রভাত, ভাদ্র ১৩১৬

····সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত।···

এই সময়েই বিষয়কর্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত—কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।··সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে এক বৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়।··বোলপুর, ২৮ ভাদ্র ১৩১১

—রবীন্দ্রনাথ, পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র, আত্মপরিচয়

বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এপারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভালো লাগত। পদ্মায় আমার জীবন-যাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর—ধূ-ধূ বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখি। সেখানে যে-সব ছোট গল্প লিখেছি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোত্তম। তারই প্রকাশ 'পোস্টমস্টার', 'সমাপ্তি', 'ছুটি', প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েছে।

—রবীন্দ্রনাথ. "মানবসত্য" (১৩৩৯), মানুষের ধর্ম

শিলাইদহে পদ্মার…বোটে ছিলাম আমি একলা; সঙ্গে ছিল এক বুড়ো মাঝি, আমার মত চুপচাপ প্রকৃতির, আর ছিল এক চাকর, ফটিক তার নাম। সেও স্ফটিকের মতই নিঃশব্দ। নির্জনে নদীর বুকে দিন বয়ে যেত নদীর ধারারই মত সহজে। বোট বাঁধা থাকত পদ্মার চরে। সেদিকে ধূ ধূ করত দিগন্ত পর্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বালুরাশি, জনহীন, তৃণশস্যহীন। মাঝে মাঝে জল বেধে আছে, সেখানে শীত ঋতুর আমন্ত্রিত জলচর পাখির দল। নদীর ওপারে গাছপালার ঘন ছায়ায় গ্রামের জীবনযাত্রা। মেয়েরা জল নিয়ে যায়, ছেলেরা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে. চাষীরা গোরু মোষ নিয়ে পার হয়ে চলে অন্য তীরের চাষের ক্ষেত্রে. মহাজনী নৌকা গুণের টানে মন্থর গতিতে চলতে থাকে. ডিঙি-নৌকা পাটকিলে রঙের পাল উড়িয়ে হু-হু করে জল চিরে যায়, জেলে-নৌকা জাল বাচ করতে থাকে, যেন সে কাজ নয়, যেন সে খেলা, এর মধ্যে প্রজাদের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ আমার গোচরে এসে পড়ত তাদের নানাপ্রকার নালিশ নিয়ে, আলোলোচনা নিয়ে। পোস্টমাস্টার গল্প শুনিয়ে যেত গ্রামের সদ্য ঘটনা এবং তার নিজের সংকট সমস্যা নিয়ে, বোষ্টমী এসে আশ্চর্য লাগিয়ে যেত তার রহস্যময় জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা ক'রে। বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম, পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বড়লে, হুড়ো সাগরে, চলন বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে। দুই ধারে কত টিনের-ছাদওয়ালা গঞ্জ, কত মহাজনী নৌকার ভিড়ের কিনারায় হাট, কত ভাঙনধরা তট, কত বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

ছেলেদের দলপতি ব্রাহ্মণ-বালক, গোচারণের মাঠে রাখাল ছেলের জটলা, বনঝাউ-আচ্ছন্ন পদ্মাতীরের উঁচু পাড়ির কোটরে কোটরে গাঙ-শালিকের উপনিবেশ। আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম-গ্রামান্তরের পথে-ফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়। সেদিন দেখলুম একজন সমালোচক লিখেছেন, আমার গল্প অভিজাত সম্প্রদায়ের গল্প, সে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে না। গল্পগুচ্ছের গল্প বোধ হয় তিনি আমার ব'লে মানেন না। সেদিন গভীর আনন্দে আমি যে কেবল পল্লীর ছবি এঁকেছি তা নয়, পল্লী সংস্কারের কাজ আরম্ভ করেছি তখন থেকেই—সে সময়ে আজকের দিনের পল্লীদরদী লেখকেরা 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটার সৃষ্টিও করেন নি। সেদিন গল্পও চলেছে, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে বাঁধা জীবনও চলেছে এই নদীমাতৃক বাংলাদেশের আতিথ্যে।…

'সাধনা'র যুগে প্রধানত শিলাইদহেই কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে বলুর[২] ফরমাস আসত, গল্প চাই। গ্রাম্যজীবনের পথ-চলতি কুড়িয়ে-পাওয়া অভিজ্ঞতার সঞ্চয় সাজিয়ে লিখেছি গল্প। তখন ভাবতাম কলম বাগিয়ে বসলেই গল্প লেখা যায়।…

রবীন্দ্রনাথের উক্তি, বক্তা-কর্তৃক পুনর্লিখিত
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, "প্রভাত-রবি", প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৪

বাংলাদেশে গল্পগুচ্ছ পড়বার যুগের অবসান হয় নি কি? অল্প বয়সে বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দের ধারা উদ্বারিত হয়েছিল তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ঐ নিরলংকৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে। আমার নিজের বিশ্বাস এই আনন্দবিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও নেই। বাংলা পল্লীর সেই অন্তরঙ্গ আতিথ্য থেকে সরে এসেছি তাই সাহিত্যের সেই শ্যামছায়াশীতল নিভৃত বীথিকার ভিতর দিয়ে আমার বর্তমান মোটরচলা কলম আর কোনোদিন চলতেই পারবে না। আবার যদি শিলাইদহে বাসা উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে মন হয়তো আবার সেই স্নিগ্ধ সরলতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে।…১১।৬ [১৯] ৩৭।

—রবীন্দ্রনাথ, শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র

২ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাধনা-সম্পাদনে সহযোগী

···লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে "উনি তো ধনীঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে রুপোর চাম্‌চে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।" আমি বলতে পারি আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়। যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মত শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লী-পরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।...১৮ ফাল্গুন ১৩৪৬

—রবীন্দ্রনাথ, "কবির উত্তর", বাঁকুড়ার জনসভায়
অভিনন্দনের উত্তরে কথিত। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭

...আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল।·· একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় একসময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে, তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে। [চৈত্র ১৩৪৭]

—রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্যবিচার", সাহিত্যের স্বরূপ
শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র, 'কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৮

আমি একটা কথা বুঝতে পারি নে, আমার গল্পগুলিকে কেন গীতধর্মী বলা হয়। এগুলি নেহাত বাস্তব জিনিস। যা দেখেছি, তাই বলেছি। ভেবে বা কল্পনা করে আর-কিছু বলা যেত; কিন্তু তা তো করি নি আমি।... [২৭ মে ১৯৪১]

—রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, শ্রীরানী চন্দ, আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

...অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখছি- বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেন নি—কিন্তু আমার অবাক লাগে তোমরা যখন বল যে আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। একসময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা, যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কী না জানি দশা হবে।[৩] কিংবা ধর একটা ক্ষ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে।[৪] এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গানজাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। দেখেছি একজন পুরুষকে নিয়ে দুজন মেয়ের রেষারেষি হানাহানি, দেখেছি পুত্রবধূর 'পরে মার সুতীব্র বিদ্বেষ, আমার চোখের বালি নৌকাডুবি পড়লে তা বুঝতে পারবে। কল্পনায় গড়েছি, কবিতায় রচনা করেছি মানসসুন্দরীকে। এ হল কবিতার কথা, কিন্তু গল্পের উপাদান এ নয়। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে। "কঙ্কাল" কি "ক্ষুধিত পাষাণ"কে হয়তো খানিকটা বলতে পার কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্য, কিন্তু তাও পুরোপুরি নয়। তোমরা আমার ভাষার কথা বল, বল যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম ক'রে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার প্রথম

৩ দ্রষ্টব্য "সমাপ্তি" গল্প

৪ দ্রষ্টব্য "ছুটি" গল্প

দিককার গদ্যে, যেমন 'কাব্যের উপেক্ষিতা,' 'কেকাধ্বনি,' এসব প্রবন্ধে পদ্যের ঝোঁক খুব বেশি ছিল, ওসব যেন অনেকটা গদ্য পদ্য গোছের। গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্পপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যেসব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কি দশা হত জানি নে।

ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।…[মে ১৯৪১]

—রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্য, গান ও ছবি," প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮।
শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সহিত আলোচনার অনুলিপি

…আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেইসকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ করে নি। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয় কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়। [২৪ মে ১৯৪১]

—রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা," সাহিত্যের স্বরূপ।
শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে লিখিত। কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৮

আমার বয়স তখন অল্প ছিল। বাংলাদেশের পল্লীতে ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করে ফিরেছি। সেই আনন্দের পূর্ণতায় গল্পগুলি লেখা। চিরদিন এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় অথচ আমাদের দেশ গল্পগুলিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে নেয় নি, এই দুঃখ আমার মনে ছিল; এবার তোমাদের 'পরিচয়ে'[১]

[১] দ্রষ্টব্য পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, "গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ"

এতদিন পরে আমি যথোচিত পুরস্কার পেয়েছি। তার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, পুরোপুরি সম্ভোগের কথা। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না। উত্তরায়ণ, ৯ জুন ১৯৪১।

রবীন্দ্রনাথ, শ্রীহিরণকুমার সান্যালকে লিখিত পত্র

শ্রীচন্দ্রগুপ্ত, শ্রীসুদর্শন, শ্রীসত্যবতী দেবী, শ্রীবনারসীদাস চতুর্বেদী রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহার বিবরণ **Forward** পত্রে (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬) প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা উদ্ধৃত হইল—

Mr. Sudarshan: Can you kindly tell us something of the background of your short stories and how they originated?

The Poet: It was when I was quite young that I began to write short stories. Being a landlord I had to go to villages and thus I came in touch with the village people and their simple modes of life. I enjoyed the surrounding scenery and the beauty of rural Bengal. The river system of Bengal, the best part of this province, fascinated me and I used to be quite familiar with those rivers. I got glimpses into the life of the people, which appealed to me very much indeed. At first I was quite unfamiliar with the village life as I was born and brought up in Calcutta and so there was an element of mystery for me. My whole heart went out to the simple village people as I came in close contact with them. They seemed to belong to quite another world so very different from that of Calcutta. My earlier stories have this background and they describe this contact of mine with the village people. They have the freshness of youth. Before I had written these short stories there was not anything of that type in Bengali literature. No doubt Bankimchandra had written some stories but they were of a romantic type; mine were full of the temperament of the village people. There was the rural atmosphere about them. So when I re-read these short stories of mine, many of which I have forgotten—unfortunately I haven't got a good memory; I sometimes forget what I wrote yesterday—they bring back to me vividly the beautiful atmosphere of these earlier short

stories. There is a note of universal appeal in them for man is the same everywhere. My later stories haven't got that freshness, that tenderness of earlier stories.

Mr. Sudarshan : Did you get some characters of your stories from living inividuals ?

The Poet : Yes, some of the characters were suggested by living individuals. For example, the character of the boy in my story "Chhuti" was suggested by a boy in a village. I then imagined what would happen to this loving and sensitive boy if he were taken to Calcutta for his education and made to live in an unsympathetic atmosphere of a family with her aunt. That was the background.

Mr. Chandra Gupta : Which of your stories do you consider as the best of the lot ?

The Poet replied smilingly : No, I cannot say that. There are several varieties of them.

The Poet went on to describe how free and how very full of joy were those days by the riverside in his youth with such enthusiasm and tenderness that the hearers were transferred in their imagination to those lovely rural scenes where everything was simple and joyful. Another story, the Poet continued, had its origin in the village life : I actually saw the girl of the type, described in the story, in a village. She was quite wild and extraordinary. There was nobody to restrain her freedom. She used to watch me everyday from a distance and sometimes she brought a child with her and with finger pointed towards me she used to show me to the child. Day after day she came. Then one day she didn't come. That day I overheard the talk of the village women who had come to fetch water from the river. They were discussing with anxiety about the fate of that girl, who was now to go her mother-in-law's house. "She is quite wild. She doesn't know how to behave. What will happen to her !" they said. The next day I saw a small boat on the river. The poor girl was forced to go aboard. The whole scene was full of sadness and pathos. One of her girl companions was shedding tears stealthily, while others were persuading and

encouraging her not to be afraid. The boat disappeared. It gave me the setting for a story named "The End" ["Samapti"].

Then there was a Postmaster. He used to come to me. He hed been away from his place for a long time and he was longing to go back. He didn't like his surroundings. He thought he was forced to live among barbarians. And his desire to get leave was so intense that he even thought of resigning from his post. He used to relate to me the happenings of the village life. He thus gave me material for a character in my story "Postmaster".

Mr. Chaturvedi : I specially like that part of the story of suggested ? It was one of the stories that has a universal appeal. It is very popular on our side.

The Poet : The story was a work of imagination. Of course there used to be a Kubuliwala, who came to our house and who became very familiar with us. I imagined that he too must have a daughter left behind in his motherland to be remembered by him.

Mr. Chaturvedi : I specially like that part of the story of Kabuliwala, where he says that he is going to his father-in-law's house.

The Poet : On our side they refer to prison as *sasurbari*. Do they do so in your parts too ?

"Yes, they do call it *sasuralaya*." One of the party replied amidst laughter in which all joined.

Mr. Chandra Gupta : You have adopted a new style in your later stories. How do you like your own earlier stories now ?

Poet : My later stories have not got that freshness, though they have greater psychological value and they deal with problems. Happily I had no social or political problems before my mind when I was quite young. Now there are a number of problems of all kinds and they crop up unconsciously when I write a story. I am very susceptible to environment and until and unless I am in the midst of a certain type of atmosphere I cannot produce any artistic work. During my youth whatever I saw appealed to me wfth pathos quite strong, and therefore, my earlier stories have a greater literary value because of

their spontaniety. But now it is different. My stories of a later period have got the necessary technique but I wish I could go back once more to my former life. I have different strata of my life, and all my writings can be divided into so many periods. They express the sentiments of those respective periods. All of us have different incarnations in this very life. We are born again and again in this very life. When we come out of one period, we are as if born again. So we have our literary incarnations also. In my case the difference is so vast that I froget my former literary births and last time when I was reading the proofs of short stories of my early period, they had a freshness for me. They seemed to come from a shadowy past. There was some vagueness about them and I remembered the period of my early life like the girl at Delhi who remembers her past life.

—*Forward*
23 February, 1936

উৎস

···একটা কথা মনে রেখো, গল্প ফটোগ্রাফ নয়। যা দেখেছি যা জেনেছি তা যতক্ষণ না মরে গিয়ে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আর-একটা মিশে গিয়ে পাঁচটায় মিলে পঞ্চত্ব পায় ততক্ষণ গল্পে তাদের স্থান হয় না।···৭ আশ্বিন ১৩৩৮

—রবীন্দ্রনাথ, পত্রধারা প্রবাসী. শ্রাবণ ১৩৩৯
শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র

ভিখারিনী

···ষোলো বছর বয়সের···আরম্ভের মুখেই দেখা দিয়েছে ভারতী।·· আমার মতো ছেলে, যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল অথচ সেটা কারো নজরে পড়ল না, এর থেকে জানা যায় চারদিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল।...আমি লিখে বসলুম এক গল্প, সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলে নি।

—রবীন্দ্রনাথ, ছেলেবেলা

পোস্টমাস্টার

কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এনগেজমেন্ট করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত।···এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অপিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনই আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম। এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরল তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে:···সাজাদপুর, ২৯ জুন ১৮৯২

—রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র, ছিন্নপত্র

গিন্নি

গিন্নি বলিয়া একটা ছোট গল্প লিখিয়াছিলাম, সেটা নর্মাল স্কুলেরই স্মৃতি হইতে লিখিত।

—রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, পাণ্ডুলিপি[৬]

···ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে।··শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম।[৭]

—রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, নর্মাল স্কুল অধ্যায়

৬ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ জীবনস্মৃতিতে উদ্ধৃত

৭ "হরনাথ পণ্ডিত নামে একজন শিক্ষক এই সময়ে নর্মাল স্কুলে ছিলেন। এই লোকটির প্রকৃতি বড় ভাল ছিল না; ছেলেদের সঙ্গে তিনি বড় ভাল ব্যবহার করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকের উপরে হাড়ে চটা ছিলেন; কখনো ইঁহার সহিত কথা কহেন নাই, ক্লাসে পড়া জিজ্ঞাসা

…এই পণ্ডিতটি ক্লাসের ছেলেদের অদ্ভুত নামকরণ করিয়া কিরূপ লজ্জিত করিতেন সাধনায় [হিতবাদীতে] গিন্নি নামক যে গল্প বাহির হইয়াছিল তাহাতে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর একটি ছেলেকে তিনি ভেট্‌কি বলিয়া ডাকিতেন, সে বেচারার গ্রীবার অংশটা কিছু প্রশস্ত ছিল।

—জীবনস্মৃতি, দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি[৬]

দালিয়া

দালিয়া গল্পটায় ইতিহাস যেটুকু আছে সে আছে গল্পের বহিঃপ্রাঙ্গণে—অর্থাৎ গাছে চড়িয়ে দিয়ে মই নিয়েছে ছুটি। আসল গল্পটা ষোলো আনাই গল্প।… ৭ আশ্বিন ১৩৩৮

—রবীন্দ্রনাথ, পত্রধারা, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৯

শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র

কঙ্কাল

ছেলেবেলা আমরা যে ঘরে শুতুম, তাতে একটা মেয়ের skeleton ঝুলনো ছিল। আমাদের কিন্তু কিছু ভয় টয় করত না। তারপর অনেকদিন কেটে গিয়েছে, আমার বিয়ে টিয়ে হয়ে গিয়েছে, আমি তখন ভিতর-বাড়িতে শুই। একদিন কয়েকজন আত্মীয়া এসেছেন, তাঁরা আমার ঘরে শোবেন, আমার উপর হুকুম হয়েছে বাইরে শোবার। অনেকদিন পরে আমি আবার সেই ঘরে এসে শুয়েছি। শুয়ে চেয়ে দেখলুম, সেজের আলোটা ক্রমে কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল। আমার মাথায় বোধ হয় তখন রক্ত বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, আমার মনে হতে লাগল কে যেন মশারির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে, 'আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল, আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল?' ক্রমে মনে হতে লাগল সে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে বন্ বন্ করে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এই আমার মাথায় গল্প এসে গেল আর কি।

—রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি। শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ ৪০০-০১

সূচনাংশের প্রসঙ্গে তুলনীয়: জীবনস্মৃতি, 'নানাবিদ্যার আয়োজন', ; ছেলেবেলা, ৭ অধ্যায়

করিলেও রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর করিতেন না। ইহার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে খুব কঠিন শাস্তি পাইতে হইয়াছে… এত কঠিন শাস্তি দিয়াও হরনাথ পণ্ডিত রবিকে কথা বা পড়া বলাইতে পারেন নাই।"—"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর", সখা ও সাথী, শ্রাবণ ১৩০২

হরনাথ, গল্পে শিবনাথ নাম ধারণ করিয়াছেন।

জীবিত ও মৃত

ছোট বৌ [পত্নী] তখনও বেঁচে। আমার তখনকার দিনে ভোররাত্রিতে উঠে অন্ধকার ছাদে ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতি অনেকরকম কবিত্ব ছিল। একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে পড়লুম, ভেবেছিলুম আমার সময় হয়েছে, আসলে কিন্তু তখন দুপুর রাত। অন্ধকার বারান্দার ভিতর দিয়ে, দালান পার হয়ে আমি grope করতে করতে চলতে লাগলুম। সব ঘরে দরজা বন্ধ, এ ঘরে ন'বৌঠান ঘুমচ্ছেন, সে ঘরে অন্য কোনো বৌঠান ঘুমচ্ছেন, সব একেবারে নীরব, নিঝুম। খানিক দূরে আসতেই আপিসঘরে না কোথায় ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। আমি থমকে দাঁড়ালুম, ভাবলুম, তাই তো, এই গভীর রাত্রে আমি সারা বাড়িময় এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ মনে হল আমি যেন প্রেতাত্মা, এ বাড়ি haunt করে বেড়াচ্ছি। আমি যেন মোটেই আমি নয়, আমির রূপ ধরে বেড়াচ্ছি মাত্র। একটা খেয়াল মাথায় এল যে, আচ্ছা, আমি যদি এখন পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে গিয়ে মশারিটা তুলে খুব solemn ভাবে প্রশ্ন করি, 'তুমি জান আমি কে?' তাহলে কেমন হয়? অবশ্য আমি তা করি নি, করলে খুব একটা scene হত নিশ্চয়। হয়তো রাত্রে মাঝে মাঝে উঠে সে ভাবতেও পারত, 'তাই তো, এ সত্যিই আর কিছু নয় তো?' কিন্তু ideaটা আমাকে পেয়ে বসল, যেন একজন জীবিত মানুষ সত্যসত্যই নিজেকে মৃত ব'লে মনে করছে।

—রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি। শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ ৪০১-০২

... অনেকদিন আগে কলকাতার বাড়িতে, ঠিক সময়টা মনে পড়ে না তবে ছোটবৌ তখন ছিলেন, একবার আত্মীয়স্বজন হঠাৎ এসে পড়ায় আমার বাইরের বাড়িতে শোবার ব্যবস্থা হয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভিতরে ছিলুম, এক সময়ে যখন আমার নির্দিষ্ট শোবার জায়গায় যাব ব'লে চলেছি - ভিতর-বাড়ি পার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে চারিদিক, আলো-অন্ধকারে বড় বড় ছায়ায় মিলে সে এক গভীর রাত্রি। সত্যিকারের রাত বলা যায় তাকে। বারান্দায় একটুখানি দাঁড়িয়ে রইলুম, মনে এল একটা কল্পনা, যেন এ-আমি আমি নই। যে-আমি ছিলুম সে-আমি নয়, যেন আমার বর্তমান-আমিতে আর আমার অতীতে একটা ভাগ হয়ে গেছে। সত্যি যদি তাই হয় তাহলে

কেমন হয়? মনে হল যদি পা টিপে টিপে ফিরে গিয়ে ছোটবৌকে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে বলি—দেখ এ-আমি কিন্তু আমি নয়, তোমার স্বামী নয়, তাহলে কি হয়।…যা হোক তা করি নি। চলে গেলুম শুতে, কিন্তু সেই রাত্রে এই গল্পটা আমার মাথায় এল, যেন একজন কেউ দিশাহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেও মনে করছে অন্য সকলেও মনে করছে যে সে সে নয় …

—রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি। শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৮২

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী অগ্রহায়ণ ১৩৫২ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে "রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত'" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত, পাবনার উকীল ও "ঠাকুর-জমিদারবাবুদের ঘরের উকীল ও আমমোক্তার", তারকনাথ অধিকারীর নিকট বাল্যে তিনি একটি সত্য ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছিলেন যাহার অনেক অংশ 'জীবিত ও মৃত'-কাহিনীর প্রথমাংশের অনুরূপ। ঘটনাটি তারকনাথ অধিকারী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন। "তাঁর কাছে শোনা সত্য কাহিনীটাই যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' কাহিনীর আসল [আংশিক] উপাদান তা অনুমান...করার যথেষ্ট কারণ আছে।" শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এই প্রবন্ধটি দেখিয়াছি।

কাবুলিওয়ালা

কাবুলিওয়ালা বাস্তব ঘটনা নয়। মিনি কিছু পরিমাণে আমার বড মেয়ের আদর্শে রচিত।...৭ আশ্বিন ১৩৩৮

—রবীন্দ্রনাথ, পত্রধারা, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'যা-তা গল্পই তো গল্প। আমার ভারি soothing লাগে। ছোট ছেলের সঙ্গে ছোট মেয়ের ঐখানে প্রভেদ। অভি [ভ্রাতুষ্পুত্রী] আমার পিছনে দাঁড়িয়ে সারাদিন ঐরকম বকে যেত। আমি বলিলাম, 'কাবুলিওয়ালার মিনির মত?' কবি বলিলেন, 'বেলাটা [জ্যেষ্ঠা কন্যা] ঠিক অমনি ছিল, মিনির কথা প্রায় তার কথাই সব তুলে দিয়েছি।'

—শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ ৩৭১

ছুটি

বিকেলবেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপর বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলে মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেআদবি মনে করে...কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়ে ছিল—গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে ত'হলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা, অমনি কার্যারম্ভ, "সাবাস জোয়ান—হেঁইয়ো।' মারো ঠেলা হেঁইয়ো।" মাস্তুল যেমনি একপাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য।...একটি ছোট মেয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দুই-একজন ভাবলে এমন স্থলে হার মানাই ভালো, তফাতে গিয়ে তারা ম্লানমুখে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল; ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জন্যে অন্য স্থান নির্দেশ করে দিলে, সে তাতে সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়ে-চড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল—তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হল।...সাজাদপুর [জুন ১৮৯১]

—রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র, ছিন্নপত্র

...আর একবার ওই রকম নৌকা ভিড়িয়েছি। নদীর তীরে গ্রামের অনেক ছেলে খেলা করতে এসেছে—প্রায় চৌদ্দ পনেরো জন। তার মধ্যে একটি ছেলেই সর্দার; আর সকলে নিরীহ বেচারীর মত তার অনুসরণ করছে। বামুনের ছেলে, বছর তেরো বয়স, স্ফূর্তি ও সজীবতার অবতার। কোমরে পৈতে বেঁধে সকলের আগে আগে হৈ হৈ করতে করতে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে 'তারে নারে না' বলে গান ধরছে। তার প্রধান আমোদ হচ্ছে এ-

নৌকা ও-নৌকা ক'রে বেড়ানো, মাঝিদের কাজ দেখা, মাস্তুলের পাল গুটানো দেখা ইত্যাদি। তীরে অনেকগুলি গুঁড়িকাঠ গাদা করা ছিল। মাঝে ছেলেটি তড়াক করে নৌকা থেকে নেমে এই কাঠগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে নদীতে ফেলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু তার আমোদের পথে একটা বিঘ্ন এসে উপস্থিত হল। একটি ছোট মেয়ে এসে একটি গুঁড়ি চেপে বসল। ছেলেটি তাকে উঠাবার কত চেষ্টা করলে, কিন্তু মেয়েটি তা গ্রাহ্যও করলে না। সে বেশ ফিলজফার-এর মত গম্ভীর ভাবে গুঁড়ি দখল করে বসে আছে। তখন ছেলেটি তাকে সুদ্ধই গুঁড়িটি উলটে দিলে। মেয়েটি পড়ে গিয়ে বিকট কান্না জুড়ে দিলে, এবং কাঁদতে কাঁদতে উঠেই ছেলেটিকে কষে এক চড় লাগালে। এই ঘটনা থেকেই 'ছুটি'র শুরু। [২ মে ১৯০৯]

— রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়, "শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ", সুপ্রভাত, ভাদ্র ১৩১৬

অসম্ভব কথা

ভূমিকাংশের সহিত তুলনীয়—

সন্ধ্যা হইয়াছে, মুষলধাবে বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে। বাগানের বেল-গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে, বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টার-মহাশয়ের আসিবার সময় দু-চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত-ভবদুপযানম্' যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা-হতোস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর-কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।

—রবীন্দ্রনাথ, 'নানা বিদ্যার আয়োজন,' জীবনস্মৃতি

ভূমিকার শেষ অংশের সহিত তুলনীয়, ছেলেবেলা', ৩ অধ্যায়, শেষ অংশ।
সমাপ্তি

আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি "জনপদবধূ" তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকা চুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়সে বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দো-পনেরো দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মত চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসঙ্কোচ কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তার মুখখানিতে কিছু যেন নির্বুদ্ধিতা কিংবা অসরলতা কিংবা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষত আধা ছেলে আধা মেয়ের মত হয়ে আরো একটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মত আত্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারি নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলা দেশে যে এ রকম ছাঁদের "জনপদবধূ" দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করি নি। দেখছি এদের বংশটাই তেমন বেশি লাজুক নয়। একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি দ্বারা জটা ছাড়াচ্ছে এবং নৌকোর আর-একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকরনার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল তার একটিমাত্র "ম্যায়া", অন্য "ছাওয়াল" নাই— কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিশুদ্ধি নেই—"কারে কি কয় কারে কি হয় আপন পর জ্ঞান নেই"— আরো অবগত হওয়া গেল গোপাল সা'র জামাইটি তেমন ভালো হয় নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হল তখন দেখলুম আমার সেই চুলছাঁটা, গোলগাল হাতে-বালা-পরা উজ্জ্বল-সরল মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তুললে। বুঝলুম বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই-একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগল। একটি ছোট মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার

কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুলখেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে সে একে ঢিপিয়ে দিত। সকালবেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগল। সকালবেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মত। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ! এই অজ্ঞাত ছোট মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল।...সাজাদপুর ৪ জুলাই ১৮৯১

-- রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র, ছিন্নপত্র

আমি একবার জমিদারী দেখা উপলক্ষে একটি নদীর তীরে নৌকা লাগিয়েছি। নৌকায় ব'সে কোন রকম কাজ করছি। এমন সময় দেখলুম একটি মেয়ে—বড় মেয়ে—হিন্দুর ঘরে অত বড় মেয়ে অবিবাহিতা প্রায় দেখা যায় না—নদীর তীর থেকে আমার নৌকার দিকে দেখছে। সে তখনই চলে গিয়ে আবার ফস করে একটি ছেলে কোলে নিয়ে ফিরে এল, এসে নৌকার এ-দিক ও-দিক দেখতে লাগল। নৌকার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিতরে দেখতে লাগল। তার সরল সতেজ দৃষ্টি, চলাফেরার মধ্যে একটা সহজ স্ফূর্তির ভাব দেখে আমার বড় ভালো বোধ হল। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সে রকম ভাব আমি প্রায় দেখি নাই। আমার মেয়েটিকে ডেকে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু আবার কি ভেবে পারলুম না। সেদিন তো গেল। তার পরের দিন দেখি আমার পাশের একটি নৌকায় চাল-ডাল, বাসন-কোসন প্রভৃতি ঘরকন্নার জিনিস বোঝাই হচ্ছে; যেন কোনো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। খানিক পরে দেখি ঠিক কালকের সেই মেয়েটিকে কনে সাজিয়ে অনেকে মিলে নৌকার দিকে নিয়ে আসছে। সে কিছুতে নৌকায় উঠবে না, আর তারাও জোর করে তাকে তুলে দেবে। সচরাচর মেয়ে-টেয়ে পাঠাবার সময় যে কান্নাকাটির ভাব দেখি, এ ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ অভাব দেখলুম। কান্নাকাটির কথা দূরে থাকুক অনেকেই বেশ স্ফূর্তি ও আমোদ করছে। কেবল একটি মেয়ে, বড় মেয়ে, সে তার মায়ের কোলে চড়ে আছে, তার লম্বা লম্বা পা দুখানা ঝুলে পড়েছে—সেই মায়ের ঘাড়ে মুখ লুকিয়ে নীরবে ফুলে ফুলে কাঁদছে। তার পরে পাশের নৌকা ছেড়ে দিলে, তীরের স্ত্রীলোকেরাও চলে গেলেন। আমি

কেবল দূর থেকে শুনলাম একটি মেয়েমানুষ আর-একজনকে বলছেন—ওকে তো জান বোন, ও ওই রকমই। কত করে বললাম, পরের ঘর করতে যাচ্ছিস, বেশ সাবধানে থাকিস, ঘাড় হেঁট করে থাকিস, উঁচু করে কথা বলিস নে; কিন্তু সে কি তা পারবে, ইত্যাদি—এই ঘটনাই আমার 'সমাপ্তি' রচনার ভিত্তি।
[২ মে ১৯০৯]

—রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,
"শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ," সুপ্রভাত, ভাদ্র ১৩ ৬

দেখতুম কিনা বোট থেকে, মেয়েরা ঘাটে আসত, কেউ বা ছেলে কোলে, কেউ বা এক পাঁজা বাসন নিয়ে, কেউ বা কলসী কাঁখে। ওই দশ-এগারো বছরের মেয়েটা, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, কাঁখে একটা ছেলে নিয়ে রোজ আসত। রোগা রোগা দেখতে, শামলা রং। বোটের উপরে আমাকে সবাই দেখত, কিন্তু ওর দেখাটা ছিল অন্যরকম। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। মাঝে মাঝে কোলের ছেলেটাকে আমাকে দেখাত আঙুল দিয়ে—'ওই দেখ'। আমার ভারি মজা লাগত। এমন একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি চঞ্চলতা ছিল তার, যা ও-বয়সের জড়সড় বাঙালীর মেয়েদের বেশি দেখা যায় না। তার পর একদিন দেখলুম বধূবেশে শ্বশুরবাড়ি চলল সেই মেয়ে। সেই ঘাটে নৌকো বাঁধা। কি তার কান্না! অন্য মেয়েদের বলাবলি কানে এল—'যা দুরন্ত মেয়ে। কি হবে এর শ্বশুরবাড়িতে?' ভারি দুঃখ হ'ল তার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া দেখে। চঞ্চলা হরিণীকে বন্দী করবে। ওর কথা মনে করেই এই গল্পটা লিখেছিলুম। ওই বোটে বাংলাদেশের গ্রামের এমন একটা সজীব ছবি দেখেছি যা অনেকে দেখে নি। ..

—রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী,
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৮৩-৮৪

মেঘ ও রৌদ্র

২৭ জুন ১৮৯৪ তারিখে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য, পূর্বে উদ্ধৃত।

আপদ

আপদ গল্পের নীলকান্ত যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে-দেখা শখের যাত্রার ছেলের দলের স্মৃতিতে রচিত চরিত্র, ইহা বর্তমান সংকলয়িতাকে লিখিত একটি

পত্রে শ্রীঅমিয়কুমার সেন, ছেলেবেলা গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চন্দননগরের বাগানবাড়ি গল্পের পটভূমি, শরতের ভাই সতীশকে রবীন্দ্রনাথ বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না, ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন।

ক্ষুধিত পাষাণ

ক্ষুধিত পাষাণের কল্পনাও কল্পলোক থেকে আমদানি।...৭ আশ্বিন, ১৩৩৮

—রবীন্দ্রনাথ, পত্রধারা, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৯

শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র

সতেরো বছরে পড়লুম যখন...এই সময়ে আমার বিলেতে যাওয়া ঠিক হয়েছে। আর সেই সঙ্গে পরামর্শ হল জাহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিলিতি চালচলনের গোড়াপত্তন করে নিতে হবে। তিনি তখন জজিয়তি করছেন আমেদাবাদে…।

আমেদাবাদে একটা পুরোনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে, বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে-পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্চার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিয়ানার।

কলকাতায় আমরা মানুষ, সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখি নি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছনফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের।

সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবতখানায় বাজছে রসনচৌকি দিনরাত্রে অষ্টপ্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ

উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠেছে ঝকঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চারদিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুসফাস। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাপজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝনঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মত, তার চারদিকে কোথাও নেই সেই রং, নেই সেই সব ধ্বনি—শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।

পুরোনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের করে, তার মাথার খুলিটা আছে মুকুট নেই। তার উপরে খোলস মুখোস পরিয়ে একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের জাদুঘরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি তা বললে বেশি বলা হবে। চাল-চিত্তির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম সেটা আমার খেয়ালেরই খেলনা।[৮]

—রবীন্দ্রনাথ, ছেলেবেলা

প্রবাসীতে যে শাহিবাগের ছবি[৯] বাহির হইয়াছে এই বাড়িতেই আমি বাস করিয়াছি এবং ইহাই ক্ষুধিত পাষাণের সেই বাড়ি। নদীতীরের দিকটা ইহাতে দেখানো হয় নাই—শীর্ণ সুবর্ণমতী নদী ইহার প্রাকারতল চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে—ইহাকেই আমি গল্পে "সুস্তা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি মনে হইতেছে। ছবিটি দেখিয়া আমার সেই ১৭ বৎসর বয়সের নির্জন মধ্যাহ্নের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনাসকল মনে উদয় হইতেছে।...[১৩০৯]

—রবীন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত পত্র

বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৫

---

৮ শ্রীঅমল হোম, শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত পত্র—

অনেক বছর আগে—ক্ষুধিত পাষাণ পড়বার অনেক বছর পরে যখন ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়, তখন তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব এবং কথাবার্তা দেখে মনে হয়েছিল ট্রেনের সহযাত্রী বুঝি তিনিই; রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন যে, ঠিক অঘোরনাথ নন, তবে খানিকটা তিনি, আর খানিকটা ঐ হায়দ্রাবাদের ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে—যিনি এক সময় St. Petersburg Universityতে সংস্কৃতের Lecturer ছিলেন—দেখে (ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল) ট্রেনের সহযাত্রীর ছবিটি আঁকেন।..."থিয়সফিষ্ট বন্ধু" দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

৯ প্রবাসী, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৯, পৃ ৩৪৪

অতিথি

বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি—খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারিদিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব ক'রে তুলছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্যই পায় কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা সমস্তই বাদ পড়ে যায়। আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধরৌদ্ররঞ্জিত ছোট নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া, এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তাহলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে একমুহূর্তে বুঝে নিতে পারত। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।···সাজাদপুর ২৮ জুন ১৮৯৫

—রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র. ছিন্নপত্র

দুরাশা

৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮।···আমি [বিপিনবিহারী গুপ্ত] বলিলাম. "টেনিসনের Princess গল্পটি যেন কয়েকজন বন্ধু মুখে মুখে রচনা করিলেন। একজন আরম্ভ করিলেন, খানিক দূর অগ্রসর হইয়া তিনি আর একজনকে বলিলেন, এইবার তুমি গল্পটা চালিয়ে যাও ; দ্বিতীয় ব্যক্তি থামিলে আর একজন গল্পটাকে আরও খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিলেন ;—এই রকম করিয়া যেন গল্পটি রচিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক আগাগোড়াই কবি লিখিয়াছেন। আপনিও নাকি ঐ রকম গল্পরচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন ?"

রবিবাবু বলিলেন, "হাঁ. আমি অনেকবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, [১০] কিন্তু কখনই মনের মত হইল না। আমি আরম্ভ করিয়া দিতাম, কিন্তু বন্ধুরা

১০। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপকদের লইয়া এইরূপ গল্প রচনার কথা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। "একদিন আমরা কবির কাছে বসে আছি, কবি

গল্পটিকে এমন করিয়া দাঁড় করাইতেন যে আমার মনে হইত সমস্তটা মাটি হইয়া গেল। দার্জিলিংয়ে একদিন কুচবিহারের মহারানী [সুনীতি দেবী] বলিলেন—'আসুন, সকলে মিলিয়া একটা গল্প রচনা করা যাক, আগে আপনি আরম্ভ করুন।' আমি আমাদের বাঙালীসমাজ-ছাড়া একটা romantic গল্পের অবতারণা করিবার প্রয়াসে বলিলাম—'আচ্ছা, বেশ'; এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দিলাম—'দার্জিলিঙে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে ঘন কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে বসিয়া একটি হিন্দুস্থানী রমণী কাঁদিতেছে।' এই বলিয়া আমি ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেখিলাম, গল্পটা অন্যের মুখে অগ্রসর হইতে চাহিল না; অগত্যা আমাকেই সমস্তটা রচনা করিয়া লইতে হইল। এই রকম করিয়া আমার 'দুরাশা' গল্পটি রচিত হইয়াছে।"

—বিপিনবিহারী গুপ্ত, "রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ", মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন ১৩২৩।

বিপিনবিহারী গুপ্ত, "ছিন্নপত্র", মানসী, ফাল্গুন ১৩১৯

কেশরলালের গল্পটা পেয়েছি মগজ থেকে। চতুর্মুখের মগজ আছে কি না জানি নে কিন্তু তিনি কিছু-না থেকে কিছুকে যে ভাবে গড়ে তোলেন এও তাই। অনেককাল পূর্বে একবার যখন দার্জিলিঙে গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন

বললেন, একটা কৌতুকজনক বিষয় মনে হচ্ছে—বিষয়টি একটি গল্পের অবয়ব রচনা নিয়েই এইরূপ—আমি একটি গল্প শুরু করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে যখন থামব, আমার ডানদিকের পরবর্তী অধ্যাপক গল্পের ধারা রক্ষা করে নিজ উদ্ভাবনা-অনুসারে গল্পাংশ রচনা করে আমার গল্পের মুখে যোজনা করবেন। পরবর্তী অধ্যাপকগণ এইভাবে ক্রমে ক্রমে সংগতি রক্ষা করে গল্পের রচনা ও অবয়ব রচনা ও যোজনা করে তাঁদের পালা সমাপ্ত করলে, আমি শেষে গল্পের উপসংহার করব। কবির কথায় সকলে সম্মতি দিলেন। গল্পও আরম্ভ ও সমাপ্ত হল। কিন্তু এই গল্পটির একটুও মনে হয় না, সে অনেক দিন পূর্বেরই কথা।"—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবির কথা, পৃ ৩৬-৩৭

অনেকে মিলিয়া 'মুখে মুখে গল্প রচনা করা'র কথা শ্রীসীতা দেবী তাঁর পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থেও উল্লেখ করিয়াছেন।

"পাঁচ-ছয়জন মিলিয়া মুখে মুখে গল্প রচনা করার একটা খেলা তাঁহারা খেলিতেন, সে কাহিনীও শুনিলাম। দলের একজন গল্পকে নানা লোমহর্ষণ অবস্থায় ফেলিয়া হাল ছাড়িয়া দিতেন, উদ্ধারের ভার পড়িত রবীন্দ্রনাথের উপর। অনেক সময় গল্পের আদি ও অন্ত দুইয়েরই তাল সামলাইতে হইত তাঁহাকে। 'দুরাশা', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি অনেক গল্পই নাকি এইভাবে রচিত হইয়াছিল।

—শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ ৬৫

কুচবিহারের মহারানী। তিনি আমাকে গল্প বলতে কেবলই জেদ করতেন। তাঁর সঙ্গে দার্জিলিঙের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে মুখে মুখে এই গল্পটা বলেছিলুম। মাস্টারমশায় গল্পের ভূতুড়ে ভূমিকা অংশটা এবং মণিহারা গল্পটিও এমনি ক'রে তাঁরই তাগিদে মুখে মুখে রচিত। ৭ আশ্বিন ১৩৩৮

—রবীন্দ্রনাথ, পত্রধারা, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৯
শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র

মণিহারা

রবিবাবু বলিলেন.. "কুচবিহারের মহারানী ভূতের গল্প শুনিতে বড় ভালোবাসিতেন। আমায় বলিতেন—আপনি নিশ্চয়ই ভূত দেখিয়াছেন, একটি ভূতের গল্প বলুন। আমি যতই বলিতাম যে, আমি ভূত দেখি নাই, তিনি ততই মাথা নাড়িতেন, বলিতেন—না, কখনই না, নিশ্চয়ই আপনি ভূত দেখিয়াছেন। অগত্যা আমাকে একটি ভূতের গল্পের অবতারণা করিতে হইল। —ভাঙা পোড়ো বাড়ি, কঙ্কালের খট্‌খট্ শব্দ, এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া আমি 'মণিমালিকা' [মণিহারা] গল্পটি তাঁহাকে শুনাইলাম। গল্পটি তাঁহার বড ভালো লাগিয়াছিল।"...৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮

—বিপিনবিহারী গুপ্ত, "রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ," মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন ১৩২৩।

বিপিনবিহারী গুপ্ত, "ছিন্নপত্র", মানসী, ফাল্গুন ১৩১৯

মাস্টারমশায়

রবিবাবু বলিলেন... "একদিন woodlandsএ নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, নাটোরের মহারাজও [জগদিন্দ্রনাথ] তথায় উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর [কুচবিহারের] মহারানী বলিলেন, 'রবিবাবু, এইবার আপনি একটি ভূতের গল্প বলুন, আপনি যে ভূত দেখেন নাই তা হতেই পারে না, আপনাকে ভূতের গল্প বলিতেই হইবে।' অগত্যা আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, তবে একটা ঘটনা বলিতে পারি; নাটোরের মহারাজ সেই ঘটনায় কতকটা অবগত আছেন, তিনি এ সম্বন্ধে কতকদূর পর্যন্ত সাক্ষ্য দিতে পারেন। একদিন নিমন্ত্রণ পার্টি হইতে ফিরিতে অনেক রাত হইল। নাটোরের মহারাজ বলিলেন—রবিবাবু, আমার গাড়ি [illegible], আসুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া

দিয়া যাইতে পারিব। অনেক দূর গিয়া আমি মহারাজার গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম, বলিলাম, কোথায় আপনার বাড়ি, আর কোথায় জোড়াসাঁকোয় আমার বাড়ি, অত ঘুরিয়া যাওয়া আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসুবিধাজনক; আমি এইখান হইতে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ি করিয়া যাইতে পারি। মহারাজার সনির্বন্ধ নিষেধ আমি মানিলাম না। কিন্তু পরে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল।' এই পর্যন্ত বলিয়া আমি একটু থামিলাম। মহারানী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তার পর ?' আমি বলিলাম. 'একখানা মাত্র ভাড়াটিয়া গাড়ি রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়োয়ানকে বলিলাম—জোড়াসাঁকোয় অমুক জায়গায় আমাকে লইয়া চল। সে কিছুতেই রাজি হইল না। নাটোরের মহারাজ তখন তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন— ভাড়াটিয়া গাড়ির টিকিট লইয়া এখানে রহিয়াছ, নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, নহিলে পুলিসের হাতে দিব—এই বলিয়া তাহার গাড়ির নম্বর টুকিয়া লইলেন। পুলিসের ভয়ে সে রাজি হইল। আমি গাডির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। মহারাজ চলিয়া গেলেন।

"আমি নিশ্চিন্তমনে বসিয়া রহিলাম। গাড়ি চলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম যে আমার পরিচিত বড় রাস্তা দিয়া গাডি চলিতেছে না. অপরিচিত অন্ধকার গলির ভিতর দিয়া গাড়োয়ান গাডি হাঁকাইয়া চলিয়াছে। কিছু বলিলাম না; ভাবিলাম বোধ হয় সহজেই বাড়ি পৌঁছাইব। কিন্তু পথ যেন ফুরায় না। হঠাৎ বোধ হইল যেন গাড়ির মধ্যে আমি একাকী বসিয়া নহি: কে যেন আমার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে। আমি অন্ধকারে হাত বাড়াইলাম. কিছুই হাতে ঠেকিল না; আবার চুপ করিয়া বসিলাম, আবার সেই রকম্ যেন মনে হইতে লাগিল, মনটা যেন কেমন ছম্-ছম্ করিতে লাগিল; গাড়ির পিছনে যে ছোকরা বসিয়াছিল তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম—ওরে তুই ভিতরে এসে বোস্। সে বলিল—না বাবু, আমি ভিতরে যাব না। যতই আমি তাহাকে আহ্বান করি ততই জোর করিয়া সে বলিতে লাগিল—না বাবু, আমি ভিতরে যাব না। এদিকে গাড়ি একেবারে গড়ের মাঠে রেড রোডের নিকটে গিয়া উপস্থিত। গাড়োয়ানকে ডাকাডাকি করিলাম, কোনো ফল হইল না। সেই বিস্তৃত ময়দানে সেই চন্দ্রালোকিত [illegible] নিশীথে, গাড়ি ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। আমার গা

ঘেঁষিয়া কি একটা যেন জিনিস রহিয়াছে অনুভব করিতে লাগিলাম, সবলে দুই হাত দিয়া সেটাকে যেন ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম। সহসা দেখিলাম যেন গাড়ির ভিতরে একটা বিকট হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম, মাথা ঘুরিয়া গেল। খানিক পরে বুঝিতে পারিলাম ভোর হইয়া আসিতেছে, এবং আমাদের বাড়িরও সন্নিকটবর্তী হইয়াছি।

"পরদিন নাটোরের মহারাজকে রাত্রির কথা বলিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া থানায় গেলেন। দারোগা আমাদের কাহিনী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের গাড়ির নম্বর কত? নম্বর শুনিয়া বলিল, আপনারা যদি কাল রাত্রে গাড়োয়ানকে ধরিয়া লইয়া থানায় আসিতেন তাহা হইলে এমন হয়রান হইতে হইত না। অনেক দিন হইল একজন কেরানী অফিস হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় ঐ গাড়ি করিয়া গড়ের মাঠে গিয়া ঐ গাড়িতেই আত্মহত্যা করে। তদবধি রাত্রিকালে ও-গাড়িতে লোক চড়িলেই ভয় পায়। আমরা তাহা জানিতে পারিয়া পাছে ঐ গাড়ির লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দি, এই ভয়ে গাড়োয়ানটা রাত্রে আর সওয়ার লয় না।'

"এই পর্যন্ত বলিয়া থামিলাম। কুচবিহারের মহারানী বলিলেন, 'অ্যাঁ, সত্য নাকি?' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'না, মোটেই সত্য নয়, গল্প করিলাম মাত্র।' এই গল্পটি পরে নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম।"...৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮

—বিপিনবিহারী গুপ্ত, "রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ," মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন ১৩২৩।

বিপিনবিহারী গুপ্ত, "ছিন্নপত্র," মানসী, ফাল্গুন ১৩১৯

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৮৪-৮৫, রবীন্দ্রনাথের উক্তি দ্রষ্টব্য।

বোষ্টমী

...বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় কিছু বদল করেছি। বোষ্টমী গুরুকে যে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়—সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।...৭ আশ্বিন, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ, পত্রধারা, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৯

শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখি[illegible]

সর্বখেপী···গেরুয়া শাড়ি-পরা, এক-আঁচল ফুল নিয়ে এই বৈষ্ণবী দুপুরবেলা খঞ্জনী বাজিয়ে যখন মাঠের আল দিয়ে 'গৌর গৌর' গান গেয়ে যেতেন তখন প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা হত ...আমরা এঁর নাম সর্বক্ষেপী বলেই জানতাম; রবীন্দ্রনাথ গল্পে এঁর নাম দিয়েছেন 'আনন্দী'। এঁর প্রকৃত জীবনকাহিনী হয়ত রবীন্দ্রনাথই জানতেন, আমরা জানতাম না। এঁর যৌবনের অপূর্ব কাহিনী যা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তা কতটা কবির কল্পনাপ্রসূত তা জানতে পারি নাই। কারণ সে বিষয়ে সর্বক্ষেপী কাউকেই কিছু বলতেন না। আমরা তাঁর প্রৌঢ়জীবনের সঙ্গেই পরিচিত।...জনসাধারণের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এঁর জীবিকানির্বাহের জন্য নাকি কুড়ি-বাইশ বিঘা জমি দিয়েছিলেন বিনা নজরে। ...রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থাকা কালে ইনি দুবেলা শিলাইদহ কুঠীবাড়িতে যেতেন এবং তাঁর পাতের প্রসাদ পেতেন। এই সব বর্ণনা বোষ্টমী গল্পের সঙ্গে হুবহু মেলে। ইনি ফুল খুব ভালবাসতেন, সব সময়েই এঁর গেরুয়া আঁচলে দেখতাম একরাশ গন্ধরাজ ফুল...ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে যেতেন কুঠীবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্য। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠলেই ইনি ভক্তিতে 'গৌর গৌর' বলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন আবার গুনগুনিয়ে গাইতেন—'গৌরসুন্দর মোর'।

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী, "রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী"
শিক্ষাব্রতী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

...বোষ্টমী স্নান করে যখন সিক্ত বস্ত্রে চলে আসছে তার গুরু বললে, তোমার দেহখানি সুন্দর। সে সময়ে তার কণ্ঠস্বরে ও মুখভাবে যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছিল সেটাতে বোষ্টমীর নিজের মনের প্রচ্ছন্ন আবেগকে জাগিয়ে দিয়েছিল। তাই সে পালিয়ে গিয়ে আপনাকে বাঁচায়। আমার বিশ্বাস গল্পের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি বুঝতে বাধা ঘটে না। ইংরেজি তর্জমায় কথাটা স্পষ্ট হয়েছে কি না জানি নে। ১৩ মাঘ [১৩৪৩]

—রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে
লিখিত পত্র, প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৯

এই বৈষ্ণবীর উল্লেখ রবীন্দ্র-সাহিত্যে অন্যত্রও আছে; যেমন, প্রথম সংস্করণ

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, পৃ ৯১, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ ; পৃ ১৫৮, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ ; বনবাণী, ভূমিকা।

স্ত্রীর পত্র

বদনাম গল্প সম্বন্ধে মন্তব্যের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

অপরিচিতা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর তাঁহার কবি-কথা গ্রন্থে (পৃ ১৩-১৬) কবির দেখা 'অতি সাধারণ ঘরের' একটি মেয়ের কবি কথিত যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার সহিত তুলনীয় 'অপরিচিতা'র ৪ অধ্যায়।

নামঞ্জুর গল্প

গল্পগুচ্ছের নামঞ্জুর গল্পের যে জায়গায় পদসেবা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ার কথা আছে তা আমার নিজের জীবনেই ঘটেছিল।...২৮ জুলাই ১৯৩৪

—রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, শ্রীরানী চন্দ, "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ" অপিচ দ্রষ্টব্য, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৩।

ল্যাবরেটরি

...সোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ-কেউ আলোচনা করতেন, [রবীন্দ্রনাথ] তাঁদের প্রায়ই বলতেন, 'সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশনো খাঁটি রিয়ালিজম, অথচ তলায়-তলায় অন্তঃসলিলার মত আইডিয়ালিজ্‌মই হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।

—শ্রীপ্রতিমা দেবী, "নির্বাণ", প্রথম সংস্করণ, পৃ ৩৮

ল্যাবরেটরি নামে গল্প যখন প্রথম ছাপা হয়...আমি [শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ] যেতেই [কবি] গল্পটা দেখিয়ে বললেন...'আর সকলে কি বলছে ? একেবারে ছি ছি কাণ্ড তো ? নিন্দায় আর মুখ দেখানো যাবে না ! আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে—সোহিনীর মত এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে। সবাই তো এই বলবে যে এটা লেখা ওঁর উচিত হয় নি ?' একটু হেসে বললেন, 'আমি ইচ্ছা করেই তো করেছি। সোহিনী মানুষটা কি রকম, তার মনের জোর, তার লয়ালটি, এই হল আসলে বড় কথা—তার দেহের কাহিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা

সহজেই সমাজে চলে যাবে, কিন্তু সোহিনীকে বাধবে। অথচ মা আর মেয়ের মধ্যে কত তফাত সেইটেই তো বেশি করে দেখিয়েছি।

—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, "কবি-কথা", বিশ্বভারতী পত্রিকা
কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

বদনাম

·· প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর পত্র গল্পে বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন.[১১] কিন্তু পারবেন কেন। তার পরে আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধে পেলুম, ছাড়ব কেন, সহুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম। ১৭ মে ১৯৪১

—রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, শ্রীরানী চন্দ, "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"

গল্পসল্প

[এই] ছোটগল্পগুলি ছেলেরা দখল করতে চায়, কিন্তু হাত ফসকে যায়। আসলে এর ভিতরের খবর বড়দের জন্যই।···২৬ মে ১৯৪১

—রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, শ্রীরানী চন্দ, "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"

জীবনের শেষ বর্ষে লিখিত এই গ্রন্থের অনেক কাহিনীতে লেখকের নানা বাল্যস্মৃতি, জীবনের উষাকালে দেখা অনেক মানুষ উজ্জীবিত হইয়াছে—এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'রাজার বাড়ি', 'ম্যাজিসিয়ান', 'মুক্তকুন্তলা', 'মুনশী', 'ভালোমানুষ'—তুলনীয় জীবনস্মৃতি, 'ঘর ও বাহির', 'বাংলা শিক্ষার অবসান', 'কাব্যরচনাচর্চা'।

জীবনের শেষ বর্ষে রচিত কয়েকটি গল্প প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, শ্রীপ্রতিমা দেবী, 'নির্বাণ', প্রথম সংস্করণ, পৃ ৫৬-৫৮।

ছোটগল্পের প্রকৃতি

ছোটগল্পের প্রকৃতি ও বড় গল্পের সহিত তাহার প্রভেদের কথা রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার "শেষ কথা" গল্পের ভিন্নতর পাঠের ভূমিকায়। (দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ ৩১৫-১৬)।

১১ বিপিনচন্দ্র পাল, "মৃণালের কথা", নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২১। স্ত্রীর পত্র গল্পটি লইয়া তৎকালে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

স্বীকৃতি

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর আগ্রহে ও ধৈর্যে এই তথ্যপঞ্জী মুদ্রণ সম্ভব হইল।

শেষ অসুস্থতার সময় লিখিত গল্প কয়টির রচনাকাল (দ্র পৃ ২৫) সংকলন করিয়া দিয়াছেন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীঅমিয়কুমার সেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সম্বন্ধে ২৬ পৃষ্ঠায় ২৪ পাদটীকার শেষাংশে মুদ্রিত তথ্য শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 'গল্পগ্রন্থের সূচী' বিভাগে গ্রন্থবর্ণনার শেষ ছত্রে মুদ্রিত তথ্য শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ও শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটলগ হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্য স্মরণযোগ্য। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সখা ও সাথী (১৩০২) পত্র ও শ্রীরামেশ্বর দে 'কুন্তলীন পুরস্কারের দ্বাদশ প্রথম' গ্রন্থ দেখিতে দিয়াছেন; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও শ্রীসুকুমার সেনের সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত গ্রন্থাদির বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই তথ্যপঞ্জী মুদ্রণে শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু ও শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক নানাভাবে সংকলয়িতার আনুকূল্য ও শ্রমলাঘব করিয়াছেন।

সংযোজন ॥ পৃ ৬৩ পাদটীকা ৮

অপিচ দ্রষ্টব্য, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর স্মৃতিকথা, নব্যভারত, পৌষ ১৩২৪—

"অঘোরনাথের সহিত আমার আলাপ পঠদ্দশার প্রারম্ভে।...বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর বক্তা—ইনি। ডাক্তারই রবীন্দ্র বাবুকে ঐরূপ ভাবে ঐ উদ্ভট গল্পটী বলেন। যাঁহারা ডাক্তারকে ভাল করিয়া জানিতেন তাঁহারা এ খবরে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না।"